বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

মে—বাঁকুড়া-সিমলাপাল, তালডাংরা, রাইপুরে পানীয় জলের সঙ্কট। নদীয়া—পাট বোনা হয়েছে ছিয়াত্তর হাজার একর জমিতে। গত বছর ছিল এক লক্ষ বিরাশি হাজার একর জমি। আউশ বোনা হয়েছে বিরাশি হাজার একরে। গত বছর ছিল দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একর।

জুন—মেদিনীপুরে 2.5 লক্ষ একর আউশ জমি সাত লক্ষ একর সব্জী জমি খরাক্রান্ত।

জুলাই—মুর্শিদাবাদে আশি ভাগ আউশ, চল্লিশ ভাগ পাট নষ্ট।

হুগলী—ঘিরা-কুন্তী ক্যানেলের উপর বুনো ফুল ফুটে আছে, ছাগল চরছে। আমন নষ্ট হয়েছে সাতচল্লিশ কোটি টাকার। পাঁচ লক্ষ একরের মধ্যে চাষ হয়েছে আটাশ হাজার একরে। আউশের সম্ভাবনা নেই। পাট আঠারো হাজার একরে হওয়ার কথা। এর মধ্যেই শতকরা পনের, চারা অবস্থায় পুড়ে গেছে।

বর্ধমান—শস্য নষ্ট আটাত্তর কোটি টাকার। এর মধ্যে আউশ ছয় কোটি, সব্জী আনাজ পনের কোটি, আমন চুয়ান্ন কোটি, পাট দুই কোটি। আমন শতকরা পঁচাত্তর ভাগ, আউশ শতকরা ষাট ভাগ নষ্ট হবে।

মুর্শিদাবাদ—ছাব্বিশটি ব্লকে দুশো একান্নটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত। পাটের ক্ষতি শতকরা চল্লিশ ভাগ; আউশ শতকরা ষাট ভাগ অর্থাৎ চোদ্দ কোটি টাকা; আমন বীজতলার ক্ষতি এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ।

মেদিনীপুরে—গতবছর আউশের ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার একর জমি, এবার 91.5 হাজার একর জমি।

বর্ধমান—শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আমন বীজতলা নষ্ট। 1125000 একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে শতকরা তিরিশ ভাগ চাষ হয়েছে, আমন শতকরা চল্লিশ ভাগ নষ্ট, পাট শতকরা পঁচিশ ভাগ, আউশ চাষ হয়েছিল শতকরা তিরিশ ভাগ জমিতে তার মধ্যে নষ্ট হয়েছে শতকরা পঁচিশ ভাগ জমির। DVC, ময়ুরাক্ষী ক্যানেল, নদীর জল, ডিপ টিউবওয়েল, পুকুর-বিল, শ্যালো—সব মিলিয়ে 455265 হেক্টর জমির শতকরা কুড়ি ভাগকেও ভেজাতে পারছে না।

নদীয়া—শতকরা বাইশ ভাগ পাট, শতকরা ছাব্বিশ ভাগ আউশ নষ্ট, ক্ষতি তিন কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। আমনের শতকরা কুড়ি ভাগ বীজতলা নষ্ট।

আগস্ট—কংসাবতী ড্যামে জল তল এতো নীচু যে বাঁকুড়ার 5 টা ব্লকে মাত্র তিন হাজার একর ফুট জল দেওয়া যাবে। Right Bank Canal দিয়ে মেদিনীপুরে আদৌ জল দেওয়া যাবে না।

বীরভূম—ধান রোয়া হয়েছে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ জমিতে, উৎপাদনের ক্ষতি শতকরা তিরিশ ভাগ।

বর্ধমান—শতকরা সত্তর ভাগ আমন নষ্ট। দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমায় মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ জমিতে চাষ সম্ভব। বাঁকুড়ায় আরও কম।

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় সেচের জল দেওয়া যাবে না, কারণ ময়ুরাক্ষী ড্যামের অবস্থা শোচনীয়।

ময়ুরাক্ষী ক্যানাল সিস্টেমের ম্যাসাঞ্জোর ড্যাম্ থেকে জল ছাড়া বন্ধ। সুন্দরবনে চাষ প্রচুর নষ্ট, 60 ভাগ লোকের খাদ্য নেই।

সেপ্টেম্বর—নদীয়ায় জুলাই মাসে বৃষ্টি 59.5 মিলিমিটার হয়েছে, আগস্টে 200 মিলিমিটার। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয় জুলাইতে 218 মিলিমিটার, আগস্টে 800 মিলিমিটার। ফলে ক্ষতি হবে তিরিশ কোটি টাকা। আউশ চাষ হয়েছিলো দুই লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার একরে, তার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত সত্তর ভাগ জমি। পাটের অবস্থাও তথৈবচ।

অক্টোবর ঃ—রবি মরশুমে DVC সেচ দেয় তিন লক্ষ একর জমিতে, ময়ুরাক্ষী দেয় এক লক্ষ একরে, কংসাবতী 1.4 লক্ষ একরে। গত 1981-82-র মরশুমে DVC দিয়েছে ষাট হাজার একর, ময়ুরাক্ষী তিরিশ হাজার একরে, কংসাবতী তিরিশ হাজার একরে।

খরা

জলাভাব

অনাহার

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1982 ও জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1983

1 টাকা 50 পয়সা

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4নং ফরম অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি :

পত্রিকার নাম : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রকাশনার ভাষা : বাংলা

প্রকাশনার স্থান : 52/9C বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-700009

প্রকাশনার কাল : দ্বিমাসিক

প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : রবীন মজুমদার, ভারতীয়, ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 92 আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-700009

মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : ঐ

সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : ঐ

প্রেসের নাম ও ঠিকানা : ইটারনিটি প্রিন্টার্স, 8 ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলিকাতা-700010

আমি, রবীন মজুমদার, ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিবরণ মতে সত্য।

স্বাঃ, রবীন মজুমদার

প্রকাশক,

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ষষ্ঠ বর্ষ : তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1982 ও জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1983

এ সংখ্যায় আছে :

সম্পাদকীয় 1

খরা—উনিশশো বিরাশি ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা —মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও রবীন চক্রবর্তী 2

পুরুলিয়া—খরা ও ভূগর্ভস্থ জল —তাপস মিত্র 6

প্রতিবেদন :

পুরুলিয়ার খরা—একজন ভুক্তভোগীর দৃষ্টিতে —মহাদেব হাঁসদা 9

খরার ঠিকানা —খাতড়া রাণীবাঁধ —অসীম চট্টোপাধ্যায় 10

গঙ্গার ধারেই খরা —নীলাঞ্জন দত্ত ও শাশ্বতী ঘোষ 12

কদমপুর—একটি গ্রামের জল সমস্যা —কুণাল চট্টোপাধ্যায় 14

খরা বিষয়ে আলোচনা —কৌশিক ব্যানার্জী 16

জলাভাব ও মানবদেহ পীযুষকান্তি সরকার 17

খরায় অনাহার ও মানবদেহ —সৌমেন গুহ 18

খরার মুখে জলের ভাবনা —সম্পাদকমণ্ডলী 19

তথ্যসূত্র 20

প্রচুর পরিমাণ মালপত্র নিয়ে চলায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে আপনার দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক ! তার উপর ওজন করা, লেবেল মারা, মাল তোলা এবং সবশেষে কুলি খুঁজে বের করে প্ল্যাটফর্মের ঐ ভীড় ঠেলে তবেই না নিজের কামরায় এসে নির্দিষ্ট জায়গায় ঐ মালপত্র রাখা ! অতিরিক্ত মালপত্র আপনার সহযাত্রীর বিরক্তির কারণ হতে পারে এবং টিকিট কালেক্টর তা পরীক্ষা করতে পারেন।

টিকিটপ্রতি যাতানুকূল প্রথম শ্রেণীতে ৭০ কেজি, প্রথম শ্রেণীতে ৫০ কেজি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩৫ কেজি মালবহন অনুমোদিত।

এর অতিরিক্ত নিলে আপনাকে অর্থদণ্ড দিতে হবে। এতে ভাবুন তো আপনার সহযাত্রীর কেমন হয়রানি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া কিরকম হতে পারে ?

সুতরাং ভ্রমণপথে আপনার মালপত্রের ওজন সম্বন্ধে নিশ্চিত হোন। অতিরিক্ত মাল ব্রেকভ্যান-এ বুক করুন। কেবলমাত্র হাল্কা ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে আপনার যাত্রাপথকে করুন আরামপ্রদ এবং এতে আপনার আকাঙ্ক্ষিত ভ্রমণ হবে উদ্বেগহীন।

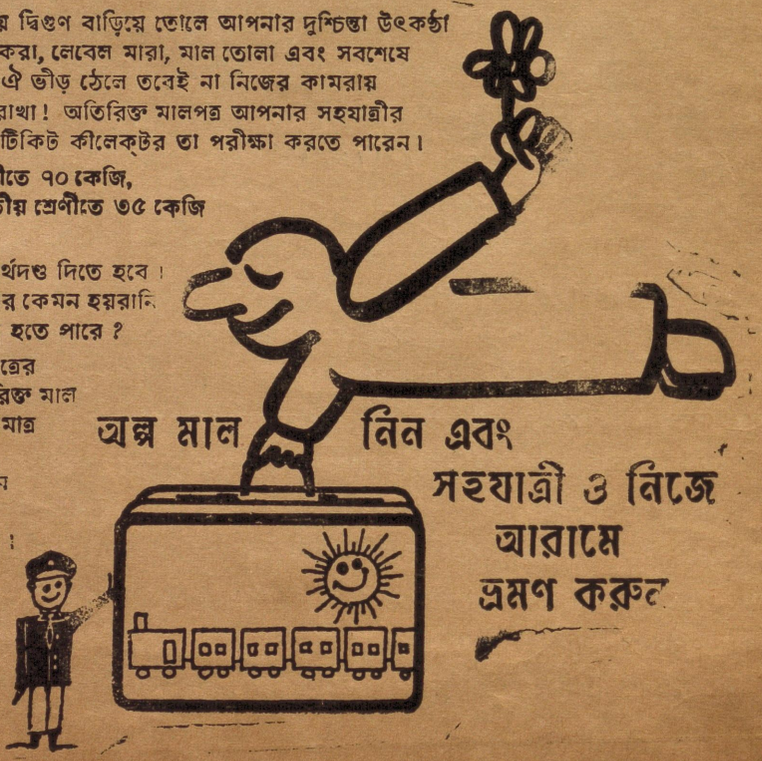

অল্প মাল নিন এবং সহযাত্রী ও নিজে আরামে ভ্রমণ করুন

S.E. RAILWAY

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর 1982 ও জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1983

সম্পাদকীয়

পাঁচ বছর একটানা নিয়মিত প্রকাশিত হবার পর এবার ছন্দ পতন ঘটল ঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর '82 সংখ্যা বি. ও. বি. প্রকাশিত হ'ল না। এতদিন ধরে সমালোচনা শুনেছি প্রচুর। কিন্তু বি. ও. বি-র যে কিছু অনুরাগীও আছেন তা এবার বোঝা গেল। অনেকেই খোঁজ নিয়েছেন, জানতে চেয়েছেন—বি. ও. বি. প্রকাশিত হয়েছে কি না। তাঁরা কেন পাচ্ছেন না। সহৃদয় পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের তাই দু'কথা জানানো দরকার।

এ এক কঠিন সমস্যা, এই বি. ও. বি-র মত পত্রিকা চালানো। ছোট পত্র-পত্রিকার সমস্ত সমস্যা তো আছেই। তার উপর আছে বিশেষ সমস্যা, কারণ বিষয়টা বিজ্ঞান ; শুধু বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় পটভূমিতে ভাববার প্রয়াস। তাই এর জন্য উৎসাহ, দরদ, অর্থ সবই সীমিত। কর্মী ও ঘরের সমস্যা, লেখার সমস্যা। ছাপাখানা-লোডশেডিং এর সমস্যা, সর্বোপরি ক্রমবর্ধমান আর্থিক দৈন্যদশা। এসব কাটিয়েও এতদিন বি. ও. বি. নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। এর উপর প্রায় হঠাৎই এসে চাপল একটি বাড়তি ব্যয়ের বোঝা—আমাদের পত্রিকার পোষ্টাল রেজিষ্ট্রেশানটা বাতিল হয়ে গেল। আমরা নাকি ভুলক্রমে এতদিন কম খরচে ডাকযোগে পাঠাবার এই সুবিধেটা পেয়ে এসেছি ; এক মাসের বেশী ব্যবধানে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা নাকি নিয়মানুযায়ী এ সুবিধা পাবার অধিকারী নয়! প্রতিবার আড়াইশো টাকার মত বাড়তি ডাক-খরচ সত্ত্বেও শেষ দুটো সংখ্যা আমরা প্রকাশ করে গেছি। অবশেষে আমরা একটু থমকে দাঁড়িয়েছি—একটু ভেবেচিন্তে খতিয়ে দেখা যাক!

আবার আমরা চলতে শুরু করেছি বটে ; তবুও ছন্দপতনের দায় আমরা এড়াতে পারি না। তবে শুধুমাত্র প্রকাশের জন্যই তো পত্রিকা-প্রকাশ আমাদের লক্ষ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সার্বিক কাজের পরিপূরক একটি কাজ হ'ল এই পত্রিকা প্রকাশ। সেদিক থেকে বিচার করলে অবস্থাটা বোধ-হয় ততটা হতাশাব্যঞ্জক নয়। আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত করা, স্লাইড ও পোষ্টার সহযোগে বিভিন্ন বিষয় জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা ইত্যাদি কাজ মোটামুটি নিয়মিত চলছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ খরায় ধুঁকছে। সামগ্রিকভাবে এ রাজ্যের জলাভাব বা জলাধিক্যের কারণ খতিয়ে দেখতে আমরা একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। কয়েকটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক কাজকর্মও শুরু হয়ে গেছে। বেশ কিছু ব্যক্তি ও সংস্থাও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা যদি তার লক্ষ্যে অবিচল থেকে সক্রিয় কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, তবে বি. ও. বি-ও যে হারিয়ে যাবে না—আশা করি বর্তমান (যুগ্ম) সংখ্যা সেই বার্তা বহন করবে।

* * * *

একটা কথা আমরা বরাবরই নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছি—এদেশের বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মীদের সামাজিক দায়িত্বের কথা, আশু কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের কথা। নিয়মিত খরা-মারী-দুর্ভিক্ষ কবলিত যে দেশ, অনাহার—অপুষ্টি-অস্বাস্থ্য যে দেশের নিত্যসঙ্গী, সে দেশের বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মীদের সামাজিক-নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দায়িত্ব হ'ল সমস্যাগুলির সমাধানের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা বিচার করা এবং প্রয়োজনে এমন কি, আন্দোলনে সামিল হওয়া। পশ্চিমবঙ্গে জলের সমস্যাটি ক্রমশই তীব্রতা পাচ্ছে। গোষ্ঠীস্বার্থে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করার মাশুল এভাবেই আমাদের দিয়ে যেতে হবে, যদি না আমরা এখনও সচেতন হই। ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমস্ত শাখাপ্রশাখার সমন্বিত সুষ্ঠু প্রয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে জলের সমস্যাটি। ভারতবর্ষের মত দেশে বিজ্ঞানীদের আশু কর্তব্য কোথায়—তা নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথা না থাকতে পারে, কিন্তু এমন কি লর্ড রাদারফোর্ডের মত অ-ভারতীয় বিজ্ঞানীর দৃষ্টিও তা এড়িয়ে যায় নি! সেই সুদূর 1938-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে যে কথাগুলি তিনি বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নিজে উপস্থিত হয়ে তিনি বলতে পারেন নি, তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কোন খাত ধরে এগোবে। কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষির, বিশেষত খাদ্যশস্য, তুলো, পাট, চা, চামড়া এবং লাক্ষার উৎপাদন বাড়ানো এবং গুণমানের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন।

হায় দুরাশা! রাদারফোর্ড আরও বছর পনের বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন—কী অবলীলায় 'স্বাধীন' ভারত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরাধীনতা বরণ করে নিতে উদগ্রীব! দেশ ও দেশের মানুষ পড়ে রইল গ্রামে, আর লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞান কেমন যত্নে শহুরে সৌধে সুপ্রতিষ্ঠিত!

'বেটার লেট দ্যান নেভার'—ইংরেজী প্রবাদবাক্যটি স্মরণ করে তবুও বলা যাক—জল সমস্যাকে কেন্দ্র করেই শুরু হোক না এদেশের বিজ্ঞানকর্মীদের সেই কাঙ্খিত অভিযান!

খরা—উনিশশো বিরাশি ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও রবীন চক্রবর্ত্তী

খরা আর বন্যা পশ্চিমবাংলার নিত্যসঙ্গী। বিগত 1978 সালের বিধ্বংসী বন্যার পর 1979 সাল থেকে প্রায় এক নাগাড়েই কোন না কোন এলাকায় খরা চলছে। বন্যা চমক দিয়ে আসে বলে বেশ সোরগোল পড়ে যায়। দেশের সর্বত্র অল্প সময়ের জন্য হলেও কিছু কিছু ভাবনার রেশ দেখা যায়। কিন্তু খরা আসে ধীরে—নিঃশব্দে। চলে দীর্ঘদিন। —যায় গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে। ইতিহাস বলে—ভারতের অসংখ্য দুর্ভিক্ষের মূলে প্রধানতঃ কাজ করেছে খরা। এ বছর অর্থাৎ 1982 সালে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রও খরা কবলিত। তবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সঙ্কটজনক। এখন শুধু আতঙ্ক।

* পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলার মধ্যে পনেরটি জেলাই কম বেশী খরায় আক্রান্ত।
* সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি হল—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বর্দ্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার অংশ বিশেষ।
* পশ্চিমবঙ্গের 40 হাজার গ্রাম ও পল্লী সমন্বিত 240টি ব্লকের 25 হাজার গ্রাম তথা 181টি ব্লক খরা কবলিত।
* সরকারী হিসেবে ফসল হানির পরিমাণ টাকার অঙ্কে 950 কোটি টাকা।
* 4 কোটি 50 লক্ষ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে প্রায় 3 কোটি মানুষ খরায় ক্ষতিগ্রস্ত।

খরা কি ? —সংজ্ঞার বদলে

বৃষ্টিপাতের অভাব হল অনাবৃষ্টি, খরা নয়। খরার অর্থ আরও ব্যাপক। অনাবৃষ্টি খরার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা অনুকূল (!) হলে এই অনাবৃষ্টির ফলে খরা হয়। প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না তুললে অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টি মানুষের জীবনযাত্রায় যে বিপর্যয় ঘটায়, ছোট্ট এই শব্দটির মধ্যে দিয়ে তাই প্রকাশ পায়। খরা গ্রামীণ মানুষের জীবনে দুর্যোগের পূর্ব সংকেত—দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশার বার্তাবাহক। খরা সমাজের পশ্চাদ্‌পরতার সূচক—শাসকশ্রেণীর জনবিমুখী চরিত্রের দ্যোতক। এই খরার সংজ্ঞা দু' এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। দিলেও তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। তাই সংজ্ঞা নয়—'খরা কি' ? —এই বিষয়ে সামান্য আন্দাজ দেওয়া যেতে পারে।

বৃষ্টি যেখানে একেবারেই হয় না বা হলেও খুব সামান্য, সে স্থান মানুষের বাসের অযোগ্য। সেটা ধর্তব্যের বাইরে থাক। কিন্তু বৃষ্টি যেখানে হয়, কিছু কম আর বেশী, সেখানে হঠাৎ প্রত্যাশিত বৃষ্টি না হলে স্বাভাবিকভাবেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়। চারদিক শুষ্ক রুক্ষ চেহারা নেয়। ফলে মাটির উপর স্তরের জল যায় শুকিয়ে। বাতাস ও মাটির এই শুষ্ক অবস্থায় মাঠে চাষ দেওয়া যায় না। মাঠে ফসল থাকলেও তা শুকিয়ে নষ্ট হয়। মানুষের জীবন—বিশেষত গ্রামীণ মানুষের জীবন তাদের নিজেদের উৎপন্ন এই ফসলের ওপর নির্ভরশীল। ফলে তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়। —বলা হয় দেশে খরা লেগেছে।

বৃষ্টি নির্ভর খরা শর্ত

* খরা এলাকা : বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 750 মিলিমিটারের কম হলে।
* খরা বর্ষ : স্বাভাবিক অপেক্ষা সারা বছরে 25 শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হলে এবং মোট পরিমাণ 500 মি.মি.-এর কম হলে।
* খরা পর্ব : স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতকালে এক নাগাড়ে 4 সপ্তাহ শুষ্ক থাকলে।
* চরম খরা বর্ষ : বার্ষিক বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক অপেক্ষা 50 শতাংশ কম হলে এবং মোট 385 মি.মি.-এর কম হলে।

স্থানীয় মানুষজন বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার উপর কতখানি নির্ভরশীল তার উপর নির্ভর করে তাদের বিপন্ন হওয়ার মাত্রা। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, ফসল ও জলের চাহিদা, জল সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদির অনগ্রসরতার উপর নির্ভর করে এই মাত্রা।

এই সমস্ত দিক বিচারে আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবাংলায় স্বাভাবিক অপেক্ষা 20 শতাংশের মত কম বৃষ্টিপাত হলে খরা এবং 33 শতাংশের মত কম হলে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দিতে পারে। —'দেখা দিতে পারে' বলা হল কারণ হলেও বিপর্যয়ের মাত্রা নির্ভর করবে আগের বছরের বৃষ্টিপাত, ফসলের উৎপাদন ও মজুত খাদ্যের পরিমাণের উপর।

তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন—বৃষ্টি ছাড়া ভূস্তরের বৈশিষ্ট্যের উপরও নির্ভর করে খরার মাত্রা। মাটির জলধারণ ক্ষমতা যেখানে কম, সেখানে বৃষ্টিপাত অন্য এলাকার তুলনায় স্বাভাবিক হলেও খরা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার কিছু অংশে এমন ভূস্তর রয়েছে। --ফলে খরা সেখানে লেগেই আছে।

খরায় ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান

এর পরের প্রশ্ন, খরার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপিত হবে কোন্ মাপে? আবারও বলতে হয়, মানুষের দুর্দশার পরিমাপ হবে কোন্ তুলাদণ্ডে? তবে সরকারী একটা মাপের ব্যবস্থা আছে বটে। তাহ'ল—টাকার অঙ্কে। কত জমির কোন্ ফসল নষ্ট হল—তার কত পণ্যমূল্য। টাকার অঙ্কে মোট পরিমাণ ক্ষতির মাপ। —সরল হিসেব, কোন দুর্বোধ্যতা নেই। কিন্তু কত মানুষ অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাল, ক্ষিদের জ্বালায় কত ঘরের সামান্য সম্বল ঘটি বাটি থালা বন্ধক পড়ল, কতজনের প্রিয় পোষা হাঁস মুরগী গরু ছাগল জলের দরে বিকালো, কতজনের শেষ সম্বল জমিটুকু হাতছাড়া হল, কত মানুষ ঋণের দায়ে সারাজীবন শ্রমের দাসখত লিখে দিল, কত হাজার গর্ভবতী স্ত্রীলোক রুগ্ন শিশুর জন্ম দিল, কত লক্ষ জীর্ণ শিশু অপুষ্টিতে ভুগে পঙ্গু ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টি করল—এই হিসেব সরকারী মানদণ্ডের অনুভূতির বাইরে। তবে আপাততঃ তাদের দেওয়া ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যাতত্ত্বই নিক্তি হোক—বাজার-পণ্য-সর্বস্ব সমাজে ক্ষতিগ্রস্ততার প্রকৃত পরিমাপ অনুক্ত থাক।

ফসলের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান

	গত বছরের উৎপাদন (লক্ষের হিসেবে)	এ বছরের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল (লক্ষের হিসেবে)	উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ (লক্ষের হিসেবে)	ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ (কোটি টাকায়)
পাট	39 গাঁট	21 গাঁট	18 গাঁট	57
আউশ (চাল)	5.76 টন	3.31 টন	2.35 টন	53.3
আমন (চাল)	50 টন	25 টন	25 টন	500
রবি শস্য	20 হেক্টর জমি	10.46 হেঃ জমি	6.45 হেঃ জমি	340

মোট ক্ষতি (আর্থিক হিসাব)—950 কোটি টাকা

এবার খরার মুখে কৃষকের লড়াই

এবার পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে কম। যাও হয়েছে খুবই অনিয়মিত। ফলে জেলায় জেলায় কৃষকরা হা পিত্যেশ করে চেয়েছিল আকাশের দিকে। বর্ষার শুরুতে প্রয়োজনমত বৃষ্টি হল না। আউশ ধান ও পাটের জন্য জল পাওয়া গেল না। জুনের মধ্যভাগ থেকে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ অবধি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় এক ফোঁটাও বৃষ্টি হল না। ধানী জমি ফেটে শুক্‌নো পাথরের চেহারা নিল। হঠাৎ জুলাইয়ে সামান্য বৃষ্টি হল। আশার আলো দেখলেন কৃষকেরা। নতুন উদ্যমে চাষে হাত দিলেন। সর্বস্ব বিকিয়ে জমির পেছনে ঢাললেন অর্থ ও তার সাথে অমানুষিক পরিশ্রম। যেখানে বীজতলা থেকে ধান রোয়া অবধি প্রয়োজন দশ সপ্তাহ সময়—সেখানে তারা প্রাণপণ চেষ্টায় সে কাজ করে ফেললেন মাত্র চার সপ্তাহে। কিন্তু আবার প্রতারিত হতে হ'ল বৃষ্টির কাছে। সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি হল না গোটা রাজ্যে। ধানক্ষেত শুকিয়ে জ্বলে গেল—মাট ফেটে চৌচির হল। —সাথে কৃষকের ভাগ্যও। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে আজও এদেশের মানুষকে চারটি খাদ্যশস্যের জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হচ্ছে। —খুবই পরিতাপের বিষয়। মুখর রাষ্ট্রনায়ক ও পরিকল্পনাকারেরা অসহায় দর্শক।

* সরকারী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে সেচ এলাকার পরিমাণ মোট জমির 30 শতাংশ। স্বাভাবিকভাবে জলের অপ্রতুলতা ও বিকল পাম্প ইত্যাদির জন্য প্রকৃত সেচ এলাকা আরও কম।

খরা ও জলসম্পদ

খরা মানে জলাভাব। —সেচের ও পানীয় উভয়ের। ফলে ফসল হানি-খাদ্যাভাব-দুর্ভিক্ষ-অপুষ্টি-অসুখ ও মৃত্যু—পর্যায়ক্রমিক পরিণতি। এই জলাভাবের প্রকৃতি বিচার করলে দু'রকমের অভাব দেখা যাবে। এক, জল সম্পদের অপ্রতুলতা জনিত। দুই, জলসংরক্ষণ ও আহরণ পদ্ধতির অভাব হেতু। পশ্চিমবাংলায় জলের অভাব তেমন নেই। তাই খরার কারণ মূলতঃ দ্বিতীয়টি।

মানুষের ব্যবহারযোগ্য জলের প্রধান উৎস বৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। তবে এই বৃষ্টি সারাবছর রাজ্য জুড়ে সমানভাবে হয় না। হয় বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে। প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই। ফলে বাড়তি জল অনেকটাই নদী বাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ে নষ্ট হয়। অন্য সময় চাষের জল মেলে না। বৃষ্টি নির্ভর কৃষি। বৃষ্টি না হলেই খরা।

জল সংরক্ষণের জন্য আমাদের দেশের পরিকল্পনাকারেরা বড় বড় ড্যামের কথা ভেবেছিলেন। বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল কারিগরী পরামর্শ। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। কিছু কিছু ড্যাম ও ক্যানাল হয়েছে। দেশী বিদেশী কোম্পানীর ব্যবসার রিটার্ন ভালই হয়েছে। যা হয়নি তা হল উদ্দেশ্য সিদ্ধি। খরা-বন্যা চক্রে দরিদ্র মানুষ আজও একইভাবে নাস্তানাবুদ। উপরন্তু অপরিণাম-দর্শী ও অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা মানুষ ও পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি করেছে। নদী গুলির নাব্যতা কমছে। জল নিকাশী ক্ষমতা কমছে এবং ক্রমাগত বহু অঞ্চল আরও বন্যাপ্রবণ হয়ে পড়ছে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 1500 মিলিমিটারের মত। সারা রাজ্য জুড়ে ধরলে এই পরিমাণ আরও বেশী। এর সাথে আছে ভূগর্ভস্থ বিশাল জল ভাণ্ডার। যার বাৎসরিক ব্যবহারযোগ্য পরিমাণ 15

মিলিয়ন একর ফুট বা 18,500 মিলিয়ন কিউবিক মিটারের মত। অথচ এই পশ্চিমবাংলায় খরা হয়—বৃষ্টিপাত 20 শতাংশ পরিমাণ কম হলেই। স্বাভাবিক অপেক্ষা 25 শতাংশ বৃষ্টিপাত কম হলেও—তার পরিমাণ দাঁড়ায় 1200 মিলি-মিটার। এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত, সংজ্ঞা অনুযায়ী খরার জন্য যে ন্যূনতম বৃষ্টির পরিমাণ ধরা হয় তা থেকে অনেক বেশী। —তবুও খরা হয়।

এ বছর বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক অপেক্ষা 25 শতাংশেরও কম হয়েছে। যাও হয়েছে—তা খুবই অনিয়মিত। চাষের কাজে যখন সেচ দরকার তখন বৃষ্টি নেই। বিকল্প ব্যবস্থাও কিছু নেই। এ বছর অনিয়মের মাত্রা বেশী—কাজেই বিপর্যয়ের মাত্রাও। এ অবস্থায় আগে থাকতেই ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ জলের সুপরিকল্পিত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকলে এমন বিপর্যয় ঘটত না। কিন্তু সে ব্যবস্থা আজও হল না।

এছাড়া স্থানীয় জলবায়ু, জলের যোগান, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি বিচারে কিছু কিছু এলাকার ফসলের ধরণ বদলালেও ফসল কিছুটা উঠতো। কারণ সব ধরণের চাষে সমান পরিমাণ জল লাগে না।

কিসে কত জল লাগে—একটি খসড়া হিসেব

* টন প্রতি মানব দেহের টিসুর জন্য 10 টন।
* টন প্রতি কাগজ উৎপাদনে 250 টন।
* টন প্রতি নাইট্রো সার উৎপাদনে 600 টন।
* টন প্রতি আখ বা ভুট্টার চাষে 600 টন।
* টন প্রতি গম ও ধান চাষে প্রয়োজন যথাক্রমে 1500 টন ও 4000 টন।

ভূজল আহরণের বিভিন্ন পদ্ধতি—পশ্চিমবঙ্গে (1979)

	মোট সংখ্যা	আনুমানিক ব্যয় (হাজার টাকায়)	আয়ুষ্কাল (বছরের হিসেবে)
অগভীর নলকূপ (স্যালো)	3369	8—10	8—10
গভীর নলকূপ (ডিপ)	2332	100	20—30
সেচের কুয়ো	25000	2—25	50—150

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বহু পুকুর সংস্কারের অভাবে হেজে মজে মশা পোকা মাকড়ের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। —যা জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। অথচ এগুলির উপযুক্ত ব্যবহার আংশিকভাবে হলেও সেচের কাজে লাগতে পারত। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় এ রাজ্যে মোট পুকুরের সংখ্যা 10 লক্ষ 90 হাজার। এর মোট আয়তন সোয়া সাত লক্ষ একর। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার ব্যবস্থা থাকলে এর অর্দ্ধেক সংখ্যক পুকুরের জলে প্রায় 11 লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব ছিল। অথচ এ ব্যাপারে সরকারী প্রয়াস মাঝে মধ্যে কিছু আলোচনা এবং কমিটি গঠনের পর্যায়েই আটকে থাকছে।

ভূগর্ভ জলের ব্যবহার—পশ্চিম বাংলায়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভূজল ব্যবহারের মাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বনিম্ন। যদিও মজুত জলের হিসাবে স্থান সর্বোচ্চ। একটু অবাক হবার মত কথা বটে। বিদ্যুৎ চালিত বা ডিজেল চালিত পাম্পের সংখ্যা অপ্রতুল। বিকল্প হিসাবে সেচের কুয়োর ব্যবস্থাও নেই। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভজলের মোট ব্যবহার বছরে 0.5 মিলিয়ন একর ফুটেরও কম—যা ব্যবহারযোগ্য মোট ভূগর্ভ জলের মাত্র 3 শতাংশও নয়।

পশ্চিমবঙ্গের দুই তৃতীয়াংশের বেশী নরম পলিজ এলাকা। এমন জায়গায় বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে জল তোলাই উপযুক্ত। শক্ত পাথুরে এলাকার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু নানান অসুবিধার জন্য এ রাজ্যে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের ব্যবহার এখনও সীমিত। এই অসুবিধের মধ্যে আছে—ছোট ছোট খণ্ডিত সেচের জমি ও পাম্প সেটের অত্যধিক চড়া মূল্য। একটি ডিপ টিউবওয়েল বসাতে খরচ এক লক্ষ টাকার উপর। আর এর সেচের ক্ষমতা 100 একর জমি। এই পরিমাণ জমি এবং এত টাকা ধনী জোতদার ছাড়া কারুর নেই। এছাড়া অন্যান্য অসুবিধেও আছে। যেমন, অনিয়মিত বিদ্যুৎ ও ডিজেল সরবরাহ, নিকৃষ্ট মানের মালমশলা দ্বারা নির্মিত পাম্প মোটর প্রায়শই বিকল হওয়া, ব্যয়বহুল সারাই ও পরিচর্যা ব্যবস্থা ইত্যাদি।

আধুনিক ব্যবস্থার অভাবে এবং মনুষ্য শ্রমের প্রাচুর্য হেতু ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই সেচ কুয়ো বহুল প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গে সে ব্যবস্থাও অপ্রতুল। সারা পশ্চিমবঙ্গে সেচ কুয়োর সংখ্যা মাত্র 25 হাজার। যেখানে রাজস্থানের এক উদয়পুর জেলাতেই এর সংখ্যা 90 হাজার। যার মধ্যে অনেক কুয়ো আছে যার গভীরতা 300 থেকে 350 ফুট। প্রচলিত পার্সিয়ান হুইল এবং মানুষ ও পশুর মিলিত শক্তিতে তোলা হয় জল। গোটা রাজস্থানে সেচের কুয়োর সংখ্যা 10 লক্ষ এবং উত্তর প্রদেশে এই সংখ্যা 16 লক্ষের মত।

অনেকের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় ভূগর্ভ জল শুকিয়ে গেছে। —পাম্পে জল উঠছে না। প্রকৃতপক্ষে জল উঠছে না মানে জল শেষ হয়ে গেছে নয়, এর অর্থ জলতল (Water table) পাম্পের সীমার তলায় নেমে গেছে। 1982 সালের অক্টোবর মাস অবধি সরকারী হিসেবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের 240টি ব্লকের মধ্যে 11টি ব্লক 'ডার্ক' এরিয়া বা 'এই মুহূর্তে আর জল পাওয়া যাবে না' এমন এলাকা বলে ঘোষিত। বাদবাকি

229টি ব্লকের মধ্যে 12টি ব্লক 'গ্রে এরিয়া' এবং 217টি 'হোয়াইট এরিয়া' বলে চিহ্নিত—যেখানে যথাক্রমে 'এখনকার জন্য যথেষ্ট' এবং 'প্রচুর পরিমাণ জল রয়েছে'।

বিশ্বের বহু দেশ ভূগর্ভ জল সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দিকে সবিশেষ নজর দিয়েছে। এর সুবিধা দু'ভাবে। এক, ভূ-পৃষ্ঠের জলভাণ্ডারের মত প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হয়ে নষ্ট হয় না, দুই জল সঞ্চয়ের জন্য চাষযোগ্য জমি জলে ডোবানোর প্রয়োজন হয় না। এ সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা এদেশে আছে কিনা জানা নেই। না থাকাই 'স্বাভাবিক'। বিনা আয়াসেই যে জল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তার সামান্য অংশও এখনো ব্যবহার করা যায়নি।

ভূগর্ভ জল সংরক্ষণের প্রয়াস দেশে দেশে

- ★ বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইজরাইলে ভূ-পৃষ্ঠের জল কৃত্রিম উপায়ে ভূগর্ভে সঞ্চিত করা হয়।
- ★ বৃটেন পরীক্ষা করে দেখেছে যে মোটামুটি 4 হেক্টর জমি হলে তাতে দৈনিক এক মিলিয়ন গ্যালন জল সংরক্ষণ সম্ভব।
- ★ ইজরাইল তাদের মোট জলসম্পদের 10 শতাংশ কৃত্রিম উপায়ে ভূগর্ভে সঞ্চয় করে।
- ★ পশ্চিম জার্মানীতে ব্যবহৃত মোট জলের 12 শতাংশ আসে কৃত্রিম উপায়ে সঞ্চিত ভূগর্ভ ভাণ্ডার থেকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, খরা কালীন অবস্থায় যেমন সেচের জলের অভাব হয় তেমনি পানীয় জলেরও। এমনিতেই গ্রাম বাংলায় সুষ্ঠু পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। সে অবস্থায় খরা পরিস্থিতিতে পানীয় জল সমস্যা কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তা সহজেই অনুমেয়। দুঃখের কথা এই পশ্চিম-বাংলায় 40 হাজার গ্রাম ও পল্লীর মধ্যে এখনও 9 হাজার গ্রামে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অথচ ভূগর্ভ জল ব্যবহারে এই সমস্যা চিরতরে বিদায় দেওয়া সম্ভব।

একটি নমুনা হিসেব ঃ

মাথা পিছু দৈনিক 15 গ্যালন অর্থাৎ 68 লিটার জল পানীয় ও গৃহস্থালী কাজে প্রয়োজন ধরলে এ রাজ্যে সকলের জন্য জলের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজন এক মিলিয়ন একর ফুটেরও কম জল।

তবে মনে রাখা দরকার ভূগর্ভ জলের ব্যবহার বাড়াতে হলে তার সংরক্ষণের ব্যাপারেও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। একথা উল্লেখ করা হ'ল কারণ যে হারে বৃক্ষ উৎসাদন প্রক্রিয়া চলছে, তাতে দ্রুত হারে মাটির জল শোষণ ক্ষমতা কমে আসছে। গাছ না থাকলে মাটির মধ্যকার ছিদ্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে জল শোষণ ক্ষমতাও।

খরা মোকাবিলা

স্বীকার করা ভাল—সমস্যাটির সমাধান, প্রবন্ধ লেখার মত সহজ নয়। সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখার মানুষদের যৌথ এবং একাগ্র প্রয়াসে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কোন একটি সাধারণ ফরমূলা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। একটি সঠিক ব্যবস্থার আচ্ছাদনে স্থানীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কোথাও হয়তো দূরবর্তী স্থান থেকে জল বয়ে আনতে হবে। কোথাও ভূজল আহরণের মাত্রা বাড়াতে হবে। কোথাও দীঘি পুষ্করিণী সংস্কার করলেই চলে যাবে। কোথাও মাটির পুষ্টি ও জলধারন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মাটির বিশেষ পরিচর্যা দরকার হবে। আবার কোথাও হয়তো ফসলের ধরণই পাল্টাতে হবে। কোথাও কৃষির সাথে পশুপালন বা সংশ্লিষ্ট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। আবার চাষ যেখানে ভাল হয় না, সেখানে অরণ্য বা গোচারণ ভূমি গড়ে তুলতে হবে। মোট কথা এমন একটি পরিমণ্ডল গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে প্রত্যেকটি মানুষ সম্বৎসর কোন না কোন ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকতে পারে। যথাসম্ভব মানুষের কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। —আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার পক্ষে সেটাই হবে সবচেয়ে উপযোগী।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা খনিজ তৈল অনুসন্ধান কিংবা পরমাণু প্রকল্প অথবা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, এর কোনটার চেয়েই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যদি দীর্ঘকাল অবহেলিত থাকে তাহলে মানুষকে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের কথা ভাবতে হবে। আমাদের দাবী, দেশের সমস্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক—এবং এখুনিই শুরু হোক সেই প্রয়াস।

পুরুলিয়া, খরা ও ভূগর্ভস্থ জল

তাপস মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে এবার খরায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হলো পুরুলিয়া। গ্রামে গ্রামে খাবার জল নেই—চাষের জল তো দূর অস্ত। কিন্তু এই যে পুরুলিয়ার চাষের জলের অভাব, পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ এটা কি শুধু এ বছরের খরার জন্যে? না এবং না। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে পুরুলিয়ার মানুষ তীব্র জলসঙ্কটে অভ্যস্ত। এ বছরের খরা বোঝার ওপরে শাকের আঁটি মাত্র। 1982-র জানুয়ারী নাগাদ কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ্যার ছাত্র কর্তৃক পুরুলিয়ার 57টি গ্রামের 21,000 লোকের ওপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিলো। গ্রামগুলোতে মোট 157টি পাতকুয়ো আছে—যার মধ্যে 72টি সরকারী। এই 157টির মধ্যে 141টিতে জল পাওয়া যায়। গরমকালে 81টি কুয়ো শুকিয়ে যায়। যে 60টি কুয়োতে জল পাওয়া যায় তার মধ্যে খাওয়ার জল আছে মাত্র 24টি কুয়োতে—যার মধ্যে মাত্র 11টি সরকারী!

নলকূপের অবস্থাও তথৈবচ। এই 57টি গ্রামে 25টি নলকূপ খোঁড়া হয়েছে। গরমকালে তাদের মধ্যে 13টি কাজ করে—পানযোগ্য জল পাওয়া যায় মাত্র 11টি থেকে।

সুতরাং গ্রীষ্মকালে এই 57টি গ্রামে প্রতি 600 জন লোকপিছু একটি করে পানীয় জলের উৎস থাকে। এই গ্রামগুলির মধ্যে পাঁচখানিতে কোন রকমের পানীয় জলের উৎস নেই। গরমকালে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় 31 এ। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সমস্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সরকারী কুয়োগুলোর মাত্র 18 শতাংশ গ্রীষ্মকালে পানযোগ্য জল সরবরাহ করে।

মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি জেলার মতো পুরুলিয়া, পলিমাটি অধ্যুষিত এবং উর্বর নয়। যদিও পুরুলিয়ার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এমনকি নদীয়ার প্রায় সমান, তবুও বৃষ্টিপাতের ফলে নদীয়া যতটা সুবিধা পায়, ভূপ্রকৃতির বিশেষত্বের জন্য, পুরুলিয়া ততটা পায় না। চব্বিশ পরগণার মতো জেলাগুলিতে বছরে তিনবার ফসল হয়েই থাকে, চারবারও হয়। পুরুলিয়ায় কিন্তু সেক্ষেত্রে ফসল হয় বছরে মাত্র একবার। খুব কম কয়েকটি জমিতে, (10—11 শতাংশ) যেগুলো নীচু এবং পুকুরের পাশাপাশি, সেগুলোতে বছরে দুবার ফসল হয়। এর আগের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, খুব কম কুয়ো বা নলকূপ গরমকালে ব্যবহারযোগ্য থাকে। গরমকালে পুকুরগুলোর জল তলানীতে এসে ঠেকে। অত্যন্ত শোরগোল তুলে সৃষ্টি হয়েছিলো কংসাবতী নদী পরিকল্পনা। কিন্তু যেহেতু পরিকল্পনাটিতে সঠিক এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল—সেই কারণে আজ কার্যতঃ এই পরিকল্পনার অন্তর্গত সেচ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সুতরাং একটা চিত্র আমাদের সামনে পরিষ্কার। ফসল বোনা এবং কাটার সময় ছাড়া পুরুলিয়ার অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এই কর্মহীনতার মোট সময় অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের চেয়ে বেশী। এই সময়টাতে গোটা পুরুলিয়ার কর্মক্ষম যুবকদের একটা বিরাট অংশ আশে-পাশের জেলাগুলিতে কাজের সন্ধানে যায়। এই সময়টাতে ক্ষুধার্ত, ক্রুদ্ধ পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে বয়ে যায় এক নিদারুণ অস্থিরতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এই জেলার অন্তরে ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম হয়।

আজ কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তৈরী উপগ্রহ বিদেশ থেকে উৎক্ষেপণ করে দেশী বিজ্ঞানীরা ও দেশের কর্ণধাররা নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়াচ্ছেন। অথচ পুরুলিয়ার পদ্মলোচন মাহাতোর জমির ফসল যখন মাজরা পোকা ও জলাভাবের যুগ্ম আক্রমণে ধ্বংস হয়, হরেরাম ওঁরাওদের বাড়ীতে তার দেড় বছরের বাচ্চা চিকিৎসার অভাবে মরে—তখন আমরা ঘুমন্ত মাছের মতো চোখ করে তাকিয়ে থাকি। এই হলো পুরুলিয়া। জলের অভাবে তৃষ্ণার্ত, ফসলের অভাবে ক্ষুধার্ত। এবং এ সমস্যা প্রতি গ্রীষ্মের তথা প্রতি বছরের সমস্যা।

॥ দুই ॥

তাহলে ঘটনাটা কি এই যে গ্রীষ্ম বা বর্ষা বর্তমানে এমন চরমভাবে আসে যে বরাবরই তার ফলাফল হয় দুর্যোগ? অন্ততঃ আজ বছরের পর বছর ধরে দুর্যোগপীড়িত গ্রামবাসীদের কথা মনে রেখে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এ দুর্যোগ মানুষের সৃষ্টি। একথা মেনে নেবার সময় এসেছে যে চেষ্টা করলে এ দুর্যোগ, দুর্ভোগের হাত থেকে কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা করা যেত, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলে,—খরা বা বর্ষার ফলপ্রসূ মোকাবিলা করা যেত।

এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু খরা ও তার মোকাবিলায় ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ কিন্তু তার আগে একটি ছোটো আলোচনা সেরে নেওয়া যাক—ঠিক কিভাবে

খরার মোকাবিলা করা সম্ভব, সে ব্যাপারে :

এক। সঠিক নদী এবং সেচ পরিকল্পনা। এ সম্পর্কে এখানে কিছু না বলা ভালো!

দুই। পুরুলিয়া বাঁকুড়ার মতো স্বভাবতঃ শুষ্ক অঞ্চলে কৃত্রিম বনসৃজন পদ্ধতিতে মাইক্রো এনভিরনমেণ্ট তৈরী করা। পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ায় এ সংক্রান্ত কিছু কাজ এখন হচ্ছে। ফলাফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে।

তিন। সঠিক কৃষিপদ্ধতি বেছে নেওয়া। পুরুলিয়ার মতো অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি শুষ্ক, অনুর্বর। অন্ততঃ এখনও অধিকাংশ জায়গায় বছরে একবার ফসল হয়। অধিকাংশ সময়ে ঠাট্টাপ্রবণ সূর্য্যদেব ফসলগুলিকে নিয়ে দেওয়ালী করেন। সুতরাং ধান চাষ সেখানে মার খায়। কৃষি বিভাগ পুরুলিয়ার সঠিক ফসল এখনো বেছে দিতে পারে নি, বা পারলেও চাষীদের নিশ্চিতি দিতে পারেনি সেগুলিকে বাজারজাত ইত্যাদি করা সম্পর্কে।

চার। ভূ-গর্ভস্থ জলের সঠিক ব্যবহার। বর্তমান প্রবন্ধে এ ব্যাপারেই একটু বিস্তৃত আলোচনা করব।

ভূ-গর্ভস্থ জল কাকে বলে? মাটির তলার যে জল নিস্কাশন করা সম্ভব, তাই ভূ-গর্ভস্থ জল। নিস্কাশন যোগ্য জল সেটাই—যে জলের চাপ আবহাওয়ার চাপের চাইতে বেশী। চাপ বেশী হওয়ার দরুন এ জল চলাচল করতে পারে।

কিন্তু এ জল থাকে কোথায়? কলকাতা গঙ্গার পলিমাটির ওপরে দাঁড়িয়ে, যেমন দাঁড়িয়ে হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ইত্যাদি। এখানে জল থাকে মাটির নীচে বালিকণার স্তরগুলিতে। পুরুলিয়া বা বাঁকুড়া আবার পাথুরে এলাকা। এখানে মাটি তৈরী হয়েছে, পাথর পচে ক্ষয়ে গিয়ে, যে পাথর এক সময়ে সর্বত্র ছিলো সেখানে। সুতরাং সেখানে মাটির কিছু তলা থেকেই পাথর শুরু। জল থাকে ওই পাথরের কোনো ফাটলের মধ্যে।

কিন্তু এই জল আসে কি করে? বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে, কিছু বাষ্পীভূত হয়, কিছু কাঁসাইয়ে মেশে, বাকীটা যায় মাটির তলায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—বৃষ্টিপাত খুব কম হলেও সেখানে মাটির তলায় জল আসে কি করে? বা পর পর কয়েক বছর খরা হলেও মাটির তলায় জল থাকে কেন?

এ সম্পর্কে খুব সাম্প্রতিক কালে একটি আলোকপাত করা হয়েছে। বাতাসে জল সব সময়েই বাষ্প হিসাবে বর্তমান। আবার মাটি বা পাথর-টাথরের ফাঁক-ফোকরের বাতাসেও কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। এখন, আবহাওয়ার বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি তুলনামূলকভাবে বেশী হয়, তবে এই জলীয় বাষ্প যে বাতাসে জলীয় বাষ্পের চাপ কম (যেমন ভূ-গর্ভস্থ বাতাসে) সেখানে সরে যাবে। আবার যেহেতু মাটি বা পাথরের তাপমাত্রা অনেক কম, সুতরাং সেখানে শিশির যেমন ভাবে তৈরি হয়, সেরকম ভাবে তরল জল বাতাস থেকে বিযুক্ত হয়ে ভূ-গর্তে জমা হবে।

॥ তিন ॥

কি করে এ জলের খোঁজ করা হয় সেটা এবার আলোচনা করা যেতে পারে। পলিমাটি অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে ড্রিল করা বেশ শস্তার ব্যাপার। কিন্তু পাথুরে এলাকাগুলিতে এক একটি ড্রিলিং-এ অনেক খরচ পড়ে যায়। সুতরাং সেখানে আগে থেকে জল কোথায় আছে, সে সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। একটা কথা বলে রাখলে ভালো হয়—পাথর বা শিলা প্রধানতঃ তিন রকমের (ক) আগ্নেয় (খ) রূপান্তরিত ও (গ) পাললিক। পাললিক শিলার মধ্যে বালি পাথরের স্তরগুলিতে জল থাকতে পারে। আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলার ক্ষেত্রে জল থাকে ফাটলগুলির মধ্যে এবং এক্ষেত্রে জল সন্ধানের জন্য ভূ-পদার্থবিদ্যার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন বৈদ্যুতিক রোধ ও শাব্দিক সন্ধান। প্রথম ক্ষেত্রে মাটিতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠিয়ে দেওয়া হয়—যার পরিমান আমরা জানি। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মাটির স্তরগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে ফিরে এলে পরে আমরা তার পোটেনশিয়াল মাপতে পারি। এবার দুটো পোটেনশিয়ালের পার্থক্য থেকে আমরা মেপে বের করতে পারি চলাচলের ক্ষেত্রে সেটি কতটা রোধের সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন শিলার রোধ আলাদা। আবার জলের রোধ কম। লবণাক্ত জলের রোধ অত্যন্ত কম। এর থেকে হিসেব করে বের করা সম্ভব বৈদ্যুতিক তরঙ্গটি কোনো জল সম্ভারের সন্ধান পেয়েছে কিনা। পেয়ে থাকলে সে জল কেমন—মিষ্টি না লবণাক্ত। যে লৌহদণ্ডগুলির সাহায্যে এই তরঙ্গ মাটির মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয় তাদের

With best compliments of :

INDIAN METALS & ALLOYS MFG CO.

Copper, Brass, Bronz & other Alloys

3 & 4, HARE STREET, CALCUTTA-700 001

PHONE : 22-3564
23-1567
23-5036

দূরত্ব যত বাড়বে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তত বেশী গভীরে যেতে পারবে।

শাব্দিক সন্ধানও প্রায় একই রকমের। মাটির ওপরে একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তারপর নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা পরপর কয়েকটি স্থান থেকে রিডিং নেওয়া হয়। ওই রিডিংগুলি বুঝিয়ে দেয় শব্দ কতটা সময় নিলো স্থানগুলোতে পৌছতে। বিস্ফোরণ স্থান থেকে যতদূরে যাওয়া যাবে শব্দ তত গভীর স্তর ভেদ করে সেখানে পৌছবে। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে শব্দের গতিবেগ নির্দিষ্ট। জলস্তরের মধ্যে দিয়েও শব্দের গতিবেগ নির্দিষ্ট। এর থেকে আন্দাজ করা যায় জল কতটা গভীরে।

এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সন্ধান 95% নির্ভুল। অথচ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে সরকারী কূয়োগুলি (নলকূপ ও পাতকূয়ো উভয়েই) গ্রীষ্মকালে অকেজো হয়ে থাকে। এক একটা অকেজো কূয়ো ঠিকাদারদের কাছে এক একটি স্বর্ণ-ডিম্ব-প্রসবিনী রাজহংসী।

॥ চার ॥

আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করার দরকার নেই। সংক্ষিপ্তভাবে হলেও ভূগর্ভস্থ জলের ব্যাপারটা আমরা বিভিন্ন দিক থেকে খতিয়ে দেখলাম। পুরুলিয়ার 57টি গ্রামে যে প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং সরকারী জল বিভাগের যে বাৎসরিক সমীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া যায় তা' থেকে অন্তত এটুকু বলা যায় যে পুরুলিয়া জেলা 'সাহারা মরুভূমি' নয় অর্থাৎ পুরুলিয়ার ভূস্তরে জল একদম নেই এমনটা নয়। তাছাড়া ভূতাত্ত্বিকভাবে পুরুলিয়ায় ভূগর্ভস্থ জলের সম্ভাবনা অবশ্যই আশা করা যায়। কিন্তু আশা করাই তো সমস্যা সমাধানের শেষ কথা নয়। আরও ব্যাপক সমীক্ষা চালাতে হবে—সঠিক পরিকল্পনা নিতে হবে, সফল কর্মোদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলো তো এমন নয় যে নতুন জানা গেল। সমস্যার বীজ অন্যত্র। তা যদি না হত তবে—

57টা গ্রামের মোট 97টি সরকারী কূয়োর মধ্যে (পাতকূয়ো ও নলকূপ মিলিয়ে) মাত্র বাইশটি গ্রীষ্মে কর্মক্ষম থাকতো না ; 21000 মানুষের জন্য মাত্র পঁচিশটি সরকারী নলকূপের দাক্ষিণ্য থাকতো না।

X-RAY UNIT

MADE IN INDIA WITHOUT ANY FOREIGN COLLABORATION
DIAGNOSTIC UNITS
(of 30 mA to 200 mA ratings)

DIFFRACTION UNITS AND CAMERAS
(for X-Ray Crystallography)

BIOLOGICAL UNITS
(for irradiation purpose)
ALSO, HIGH VOLTAGE TESTING SETS, OIL TESTING SETS,

RADON HOUSE (PVT) LTD.
7, SARDAR SANKAR ROAD,
CALCUTTA-700 026.

PHONE : 46-1773 Gram : RADHOUZ

Service Centre :
RANIHAT, CUTTACK-753001.
ORISSA.

প্রতিবেদন ঃ

[বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়দায়িত্ব বিষয়ে কথার খই অনেক ফোটে। কিন্তু চর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বহন করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত এক ভাবমূর্তি। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ কিভাবে ব্যাপক সাধারণ মানুষের কাজে লাগতে পারে তা জানতে ও বুঝতে হ'লে বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মীদেরও সম্যক ও সামগ্রিক পরিচয় থাকা চাই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে। অথচ এখানেই হয় মুশকিল ; মানুষের সমস্যা, তার সংগ্রাম ও শক্তির কথা বলতে গেলেই একদল গেল গেল রব তোলেন ; অজুহাত দেন ও সব তো রাজনীতিকদের কাজ—সমাজ-সংস্কারকদের মাথা ব্যথার ব্যাপার! আমরা তেমনটা মনে করি না, বরং আমাদের মনে হয় একটা বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক কোথায় কিভাবে বিজ্ঞানকে সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানে কাজে লাগাতে হবে, সেবিষয়ে বিজ্ঞান-বিজ্ঞানকর্মীদের অজ্ঞতার দরুণ, অনেক সময়ই সমাধানসূত্রগুলি হয় তাত্ত্বিক। দেশের মানুষ ও তাঁদের সমস্যার সঙ্গে বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরী। এই প্রতিবেদনগুলির তাই বিশেষ প্রয়োজন আছে।]

পুরুলিয়া খরা—একজন ভুক্তভোগীর দৃষ্টিতে

মহাদেব হাঁসদা

পুরুলিয়ার চারদিক এখন খরায় জ্বলছে। খরা এখানে এর আগেও হয়েছে, কিন্তু এমনটি দেখা যায়নি। চাষীরা ভুট্টার চাষ করেছিল, শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির অভাবে সেগুলো মারা গেছে। বাইদ বা ডাঙ্গা জমিতে যে ধান রোওয়া হয়েছিল, সেগুলোও নষ্ট হয়েছে। পুকুর বা নালার জল সেচ দিয়ে যেটুকু জমিতে বহাল ধান চাষ হয়েছে, তা কেবল অবস্থাপন্ন লোকেদেরই। গরিব বা মধ্যবিত্তদের কিছু হয়নি। খরার ফলে পুরুলিয়ার প্রায় 65-70 শতাংশ ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

এখন থেকেই খরার ভয়ে সকলে ভীত। খেটে-খাওয়া লোকেদের অধিকাংশই কার্তিক মাসে বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলায় 'নামাল' খাটতে গেছে। উত্তর পুরুলিয়ার খেটে খাওয়া লোকেরা ধানবাদের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে বা শহরে কাজের সন্ধানে চলে যাচ্ছে। বনাঞ্চলের লোকেরা প্রকাশ্যে বনের গাছ কেটে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আশংকা করা যায়, মাঘ মাস থেকে (অর্থাৎ বর্ধমান, হুগলি ইত্যাদি জেলা থেকে কৃষি শ্রমিকেরা ফিরে এলে) খরার ভয়াবহ চেহারা পরিলক্ষিত হবে, মানুষ ও গবাদি পশুর স্নানের জল, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার জল কোথাও পাওয়া যাবে না। পয়সা দিয়েও হয়তো খাবার মিলবে না, কিংবা বাজারে চাল, গম, ভুট্টার দর সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে চলে যাবে। পানীয় জলের সংকট ফাল্গুন মাস থেকেই দেখা দেবে।

পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে এই খরা ভাদ্র মাস থেকেই শুরু হয়েছে। অন্য বৎসর এই সময় ভুট্টা ও বাইদ ধান চাষীরা ঘরে তুলতো। এবারে তা হয়নি। ভাদ্র-আশ্বিনের উৎসব করম নাচ, ভূয়াং নাচ, কাঠি নাচ এ বৎসর হয়নি বললেই চলে। বাঁদনা উৎসবেও এবার অনেক গ্রামে নাচ-গান, আনন্দ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়নি। উত্তর পুরুলিয়ার সাঁওতালদের আগামী 'সহরায়' উৎসব এবং অন্যান্যদের 'টুসু' পরবেও মাদল, ধমসা বাজবে না বলেই মনে হয়।

খরা মোকাবিলার জন্য সরকারী স্তরে অনেক জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কার্যতঃ এখনও কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত থেকে দু'একটি জায়গায় পাহাড়তলীর নালা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, পুরানো রাস্তা মেরামতের জন্য মাটি ফেলা হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও উঁচু জায়গা থেকে চাষের জমিতে বর্ষাকালে জল আনার জন্য নালা কাটা হচ্ছে। কিন্তু এগুলো সবই ছোট ছোট স্কীম। কোথাও একদিনের বেশি কাজ চলছে না। তারপর অনির্দিষ্ট-কাল বন্ধ। বিরোধী দলের লোকেরা এইসব কাজে প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন।

পুরুলিয়া জেলায় ITDP. DPAP, IRDP, CADP, ILO প্রভৃতি প্রকল্প আছে। এছাড়া, বেশ কয়েকটি দেশী-বিদেশী সেবাসংস্থা জেলায় আছে। কিন্তু খরা মোকাবিলার জন্য এখনো পর্যন্ত তাদের কাজ চোখে পড়ছে না।

আমরা বিভিন্ন সরকারী অফিসে কাজের জন্য আবেদন-নিবেদন করছি। খরাত্রাণ তহবিলে চাকুরীজীবী ও অবস্থাপন্ন লোকেদের যথা সম্ভব দান করতে বলছি। আপাততঃ এই পর্যন্তই।

আমরা মনে করি, জরুরী ভিত্তিতে কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী নিয়ে ব্যাপক-ভাবে কাজ শুরু হলে খরার হাত থেকে অনেকে বাঁচবে। পুরানো বাঁধ,

পুকুর ও কুঁয়োর সংস্কার এবং অকেজো নলকূপগুলো এখনই মেরামত করা দরকার। গ্রামের কাছে বা কিছু দূরে যেখানে অল্প আয়াসে জল পাওয়া যাবে, সেখানে পাতকুয়ো বা ডাড়িকুয়ো খনন করা প্রয়োজন। এখান থেকে মানুষ ও গবাদি পশুর স্নানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণী কেন্দ্র ও লঙ্গরখানা খোলা দরকার। জি. আর. ও এম. আর. শপের মালের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক, খাতা, টিফিন দিতে পারলে ভালো হয়। আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের এই বৎসর গোড়া থেকেই হোস্টেলে বিনা খরচে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় বহু ছাত্রের পড়াশুনা এ বৎসর বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিশেষে বলতে হয়, খরাপীড়িত মানুষদের বাঁচাতে হলে ত্রাণ ব্যবস্থায় যাতে দুর্নীতি ও দলবাজী না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কোথায় এবং কোন স্কীমে কত টাকা খরচ করা হচ্ছে তা জনগণকে জানানো দরকার। এরজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সমাজসেবী সংস্থা ও ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিটি পঞ্চায়েত স্তরে খরাত্রাণ কমিটি গঠন করা একান্ত আবশ্যক।

খরার ঠিকানা—খাতড়া রাণীবাঁধ

অসীম চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়া শহর থেকে বাসে ঠিক দু'ঘণ্টা। থানার নাম খাতড়া। দিক-নির্ণয়ের হিসেবে খাতড়া বাঁকুড়ার দক্ষিণে। অনেক মনকাড়া প্রতিশ্রুতির রহস্যে ঘেরা মূল কংসাবতী প্রকল্প এই খাতড়ারই মুকুটমণিপুরে। কিছুটা হাঁটতে রাজি থাকলে ঠিকানা মেলে রাণীবাঁধ থানার—জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে। আমাদের দেখা অঞ্চলটা খাতড়া-রাণীবাঁধ সীমান্ত।

1971 সালের আদমসুমারির কাগজ-কলমের হিসেব বলছে—খাতড়ার লোক-সংখ্যা 116550 জন, যার মধ্যে শতকরা 22.35 জন আদিবাসী। আর রাণীবাঁধের লোকসংখ্যা 77094 জন, শতকরা 45.86 জন আদিবাসী।

অঞ্চলটায় ধান হয় পাঁচ রকম। চালি বা গোড়া ধান, কার্তিকা ধান, আমন বা শোল, বোরো আর কেলে আউশ বা ভূতমুড়ি ধান। এছাড়া ভুট্টা, জনার, আখ হয় কিছু। বিরাশির খরা মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে সবকটা—ঘরে ওঠেনি প্রায় কিছুই। একর প্রতি ধানের স্বাভাবিক ফলন 25 থেকে 30 মণ। রাণীবাঁধ থানার পুরোপুরি আদিবাসী অধ্যুষিত বড়দা গ্রামে দেখেছি—এক একর জমি থেকে ঘরে এসেছে সাকুল্যে 20 সের ধান! হিসেবটা দাঁড়ায় শতকরা দু'ভাগ। তবে বিরাশির ডিসেম্বরের শেষপ্রান্তের খবর বলছে—শতকরা 25 ভাগ ধান নাকি পাওয়া গেছে।

অন্যকথা বলার আগে সীমান্ত অঞ্চলটার সেচের কেচ্ছা শোনানো যাক। ডিপ্ টিউবওয়েল্ বা শ্যালো নেই একটাও, পুকুর গেছে শুকিয়ে। ডুয়ে ডুয়ে চার হয়ে লালচে মাটি শুকনো রয়ে গেছে। মানুষগুলো আদিম যুগের ঐতিহ্য বুকে নিয়ে ঘোলাটে চোখে আকাশ দেখেছে—মেঘ কি জমছে? বৃষ্টি কত দূরে? কিন্তু স্বপ্নের বৃষ্টি মাটিকে ছোঁয়নি। বুভুক্ষার আগুন ছারখার করেছে গ্রামের পর গ্রাম।

কিন্তু প্রশ্ন একটা উঠবেই। লেখার শুরুতেই জোরগলায় বলেছি—মূল কংসাবতী প্রকল্প এই খাতড়ারই মুকুটমণিপুরে। তাহলে? কংসাবতীর অগাধ নীলচে জলই তো সিক্ত করতে পারতো খাতড়া-রাণীবাঁধের লালচে মাটিকে। তাহলে?

ঐ 'তাহলে'র পিছনে একটু রহস্যের ইঙ্গিত আছে। প্রথমতঃ, কংসাবতীর জলরাশি অগাধ ছিলো না, ক্যানেলগুলো শুকিয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধান রহস্যময় জায়গাটা হলো—যদিও খাতড়াতেই মূল কংসাবতী প্রকল্প, যদিও খাতড়া-রাণীবাঁধের 'মাথায় কংসাবতীর জল', তবুও—খাতড়া-রাণীবাঁধ কংসাবতীর জল পায় না। পায় না নয়, আসলে দেওয়া হয় না। কারণটা জানতে পারি নি। মোটামুটি শুনেছি, নদীকে বেঁধে ঐ অঞ্চলে জলের মাত্রা অনেক নেমে গেছে, ফলে জল দেওয়া যায় না। রিভার লিফ্ট্ পাম্প করলে দেওয়া যেতো, কিন্তু তাতে যা খরচ হতো, তার থেকে উৎপাদিত ফসলের মূল্য অনেক কম হতো--'কস্ট-বেনিফিটে' আসতো না!

যুক্তির বেড়াজাল বঞ্চিত করেছে সীমান্ত এলাকাকে। কস্ট বেনিফিটে আসতো কি না জানি না, তবে মানুষগুলো বলেছে—কংসাবতী প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে অঞ্চলে ফলন কমে গেছে।

পানীয় জলের প্রশ্নটা সমস্যা হিসেবে দ্বিতীয়। কিছু কুয়ো আর ইঁদারায় জল মিলছে। গোড়াবাড়ি, ভুঁইঞাপাড়া, অম্বিকানগরের মানুষের লাইন পড়ছে ইঁদারায়। টিউবওয়েল চালু আছে গড়ে প্রতি চারটের মধ্যে একটা। বাঁকুড়ার অন্যান্য অনেক জায়গার সাথে তুলনামূলক বিচারে খাতড়া-রাণীবাঁধ সীমান্তে পানীয় জলের জন্য হাহাকার কম। কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য জল মিলছে না। কংসাবতীর তলানি জলে স্নান করছে মানুষ। কিন্তু গরু-

ছাগলকে স্নান করানো যাচ্ছে না মাসের পর মাস। যদিও গোরু-ছাগল ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এলাকা থেকে।

বাঁকুড়ার কোনো কোনো থানাকে ঘোষণা করা হয়েছে 'খরা এলাকা' হিসেবে—ইন্দপুর, সিমলাপাল, রাইপুর, রাণীবাঁধ। খাতড়া থানাকে দীর্ঘদিন রাখা হয়েছিলো ঘোষণার বাইরে। অবশেষে— নভেম্বর মাসে খাতড়ার 2 নং ব্লককে ঘোষণার আওতায় আনা হয়েছে। আজও উপেক্ষিত 1 নং ব্লক।

'খরা এলাকা' ঘোষিত না হওয়ার ফলে খাতড়ার গ্রামগুলোতে সরকারী প্রকল্পে কোনো কাজ হয় নি। উপবাসী মানুষগুলো সরকার—বেসরকার সর্বত্র কাজের খোঁজ করেছে। রাণীবাঁধ থানায় সরকারী প্রকল্পে মাটি কাটার কাজ হচ্ছিলো, সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে খাতড়ার মানুষকে। তবে—রাণীবাঁধের সরকারী কাজের নমুনাটা এরকম।

গ্রাম—বড়দা
তত্বাবধায়ক—ঠিকাদার
কাজ—মাটিকাটা
কাটার এলাকা – 100 কিউবিক্ ফুট
কর্মী—পুরুষ-নারী-শিশু
কাজের সময়—8 ঘণ্টা (সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে)
মজুরী—6 টাকা 50 পয়সা

কাজ শুরু হয়েছিলো 28 অক্টোবর 1982 থেকে। হয়েছে ভীষণ অনিয়মিত-ভাবে—মাসে হয়তো চারদিন, বড়জোর ছ'দিন। কিন্তু আসল কথাটা এখনও বলা হয় নি। ঐ যে 6 টাকা 50 পয়সা মজুরী, ওটা একজনের আটঘণ্টা কাজের পারিশ্রমিক নয়। সম্পূর্ণ কাজটা অর্থাৎ 100 কিউবিক ফুট মাটি কাটার মোট মজুরী। এখনও বিষয়টা পরিষ্কার হয় নি। দীর্ঘদিনের অনাহার, অপুষ্টি মানুষকে করে দিয়েছে চূড়ান্ত দুর্বল, কোদাল গাঁইতি ধরার শক্তিটুকু প্রায় নিঃশেষ। ফলতঃ—100 কিউবিক ফুট মাটি 8 ঘণ্টায় কাটতে পারছে মোট 4 জন মজুর এবং তার মিলিত মজুরী ঐ 6 টাকা 50 পয়সা। মাথাপিছু হিসেবে ভাগে পড়ে এক টাকা দশ আনার মতো! 'খরা এলাকা' হিসেবে অঘোষিত খাতড়ার 1নং ব্লক আর ঘোষিত রাণীবাঁধ থানায় সরকারী অবদান এক টাকা দশ আনা—মাসের কয়েকটা দিন!

গোরু-বাছুর হাঁস-মুরগী-ছাগল-ঘটি-বাটি এমনকি গাঁইতি পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে, দিনগুলো কিভাবে যেন কেটেছে। গুড়াখু তামাকের টিন হয়েছে জলের গ্লাসের বিকল্প। কেরোসিনের অভাবে রাতে আলো জ্বালা নিষিদ্ধ। কোনমতে কিছু জুটে গেলে ওরা খেয়ে নেয় অন্ধকারেই, কখনো বন্ধু হয় চাঁদের আলো। এক কেজি জনারকে ভেঙে, সেদ্ধ করে, সাত আটজনে মিলে দু'দিনে একবেলা খাওয়া আজ ওখানের স্বাভাবিক নিয়ম।

খরা বাঁকুড়ার প্রতি বছরের নিশ্চিত অতিথি। তবে অন্য বছর ওরা পুবে (অর্থাৎ বর্ধমান-হুগলীতে) যায় কাজ করতে। এবছর প্রথমদিকে ওরা পুবে যেতে পারে নি। একদিকে সেখানেও কাজ নেই, অন্যদিকে যাওয়ার গাড়ি-ভাড়াটুকুও নেই। শেষদিকের খবর—বর্ধমানের জোতদাররা লোক পাঠিয়ে, গাড়িভাড়া দিয়ে, খাতড়া-রাণীবাঁধ থেকে মজুরদের নিয়ে গেছে। এতো সস্তা মজুর তো সহজে মেলে না।

এবার একটু বিকল্প কাজের হিসেব দেওয়া যাক :

কাজ	সময় লাগে	পয়সা মেলে
তালাই (চাচাই) বোনা	একটা বুনতে 10 দিন	5 থেকে 6 টাকা
ঝাঁটা তৈরী	5 টা করতে 1 দিন	ঝাঁটাপিছু 20 পয়সা
ছিপে মাছ ধরা	10 ঘণ্টা	1·50 থেকে 3.00 টাকা
শামুক-গেঁড়ি কুড়োনো	10 ঘণ্টা	75 পয়সা
ঘাস কাটা	10 ঘণ্টা	75 পয়সা
বাঁশ দিয়ে মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরী	একটা করতে 2 দিন	2·50 টাকা

পয়সার হিসেবটা গল্পকথা মনে হতে পারে। আরো মনে হবে, যখন শোনা যাবে—এইসব পণ্যও দিনের পর দিন পড়ে থাকে, কারণ কেনার লোক নেই। শবর কলোনীতে লাঙল বানানো, ঝুড়ি তৈরী, দরজা-কপাট তৈরী, চিঁড়ে কোটার কাজ হতো। এখন সব বন্ধ।

র‍্যাশন্ ব্যবস্থার করুণ অবস্থা। সপ্তাহে একদিন মাল দেওয়া হয়—500 গ্রাম আতপচাল, 75 গ্রাম চিনি—মাথাপিছু। ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে র‍্যাশন্ তুলতে না পারলে তা ডিলারের অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

কামারকুলি মৌজায় রিভার লিফট পাম্পের জন্য টাকা মঞ্জুর হয়েছিলো বেশ ক'বছর আগে। আজও লিফ্‌টের দেখা মেলেনি। গত 1978এর বন্যার পর রাজ্যপাল মুকুটমনিপুর পরিদর্শনে গেছলেন। খাতড়ার লোকেরা তাঁর কাছে লিফ্‌টের জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে লিখিত আবেদন করে। রাজ্যপাল সাহেব "বাঃ, বাঃ, বেশ হয়েছে" বলে প্রশংসা করেন। এটা 1983, লিফ্‌টের ঠিকানা মেলে নি। বাসিন্দারা বলেছে—লিফ্‌ট্ হলে অন্তত 500 থেকে 700 একর জমি ভিজিয়ে দেওয়া যেতো।

লোকসংস্কৃতির সমস্ত দিকগুলোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে খরার বিষ। বন্ধ হয়ে গেছে তুষু-ভাদুর গান, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না মাদল-ধামসার, চোখে পড়ে না ভুয়াং-করম ছৌ নাচ।

রাণীবাঁধ থানার অম্বিকানগরে কাঁসাই আর কুমারী নদীর সঙ্গমস্থল। শুকনো খটখটে প্রান্তর। আগে 6 ইঞ্চি খুঁড়লেই জল বেরিয়ে আসতো। এখন জলের স্তর নেমে গেছে প্রায় 25 ফুট নিচে।

সামাজিক-আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে খরাকে দেখতে গেলে এগুলো সবই চোখে পড়ে। সবটা লেখা হলো না, সবটা লেখা হয় না।

তবে—

বাঁকুড়ায় ফি বছরই খরা, এবার হয়েছে আকাল। কিন্তু আরও বড়ো আকাল সামনে আসছে। সাধারণতঃ বর্ষাকালে চাষের কাজ হয়, হেমন্ত শীতে হয় ধান কাটার কাজ। পুকুর কাটা অথবা ঘরামির কাজ হয় কিছু সময়। ধান কাটতে পুবে অর্থাৎ বর্ধমান হুগলীতে যায় ওরা। আর ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে সাধারণভাবেই প্রতিবছর কোনো কাজই মেলে না। যেদিনগুলো সামনে আসছে। সাধারণ পরিস্থিতি আর এ বছরের স্বপ্নভাঙা আকাল—দুয়ে মিলিয়ে খাতড়া রাণীবাঁধ সীমান্তের মানুষের দিকে এগিয়ে আসছে মৃত্যুর কালো ছায়া॥

গঙ্গার ধারেই খরা

নীলাঞ্জন দত্ত ও শাশ্বতী ঘোষ

[গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র পরিকল্পিত খরা-সমীক্ষার অংশ হিসেবে একটি প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। এখানে যে সমস্ত সংখ্যাগত তথ্য এবং সিদ্ধান্ত দেওয়া হল সেগুলি পরবর্তী গভীরতর অনুসন্ধানে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।]

জেলা নদীয়া, থানা শান্তিপুর, মৌজা চর জিজিরা। শান্তিপুর পৌরসভার এলাকা (যদিও স্থানীয় লোকেদের মতে, পৌর এলাকার সুযোগ-সুবিধা—আলো, পায়খানা, ড্রেন—কিছুই নেই এখানে)। শহরের উপকণ্ঠে গঙ্গার ওপরে এই বিশাল চর। গঙ্গা এখানে নেহাৎ শীর্ণকায়া নয়—"দুশো হাতেরও বেশী চওড়া হবে"। এই মৌজা তৈরী হয়েছে আসলে দুটো চর নিয়ে—জিজিরা চর আর রামনগর চর। এক একটি চর ভাগ হয়েছে কয়েকটি পাড়ায়। জিজিরা চরের মধ্যে পড়ে রামনগর পাড়া, কুর্মিপাড়া, রাজবংশী পাড়া, সদগোপ পাড়া, গবার চর আর ইস্টিমারের ঘাট। রামনগর চরের ভেতর আছে কুর্মিপাড়া, সদগোপ পাড়া, বাঁশতলা, খেলার মাঠ ও বক্তার ঘাট। পাশাপাশি আছে আর একটি চর—নাম সুতরাগড়—আলাদা মৌজা—তবে সবকিছুই একই রকম।

এসব চর তৈরী হয়েছে বহু প্রাচীন কালে- পরে আর বাড়েনি বড় একটা। আগে সামান্য (শ' খানেক ঘর) বসতি ছিল—হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হবার সময় পূর্ববঙ্গের লোকে দলে দলে এসে বাস করতে শুরু করে। এখন প্রায় হাজার তিনেক ঘর রয়েছে। বেশীরভাগই ছোট চাষী—জমির পরিমাণ দু' থেকে দশ বিঘের মধ্যে। নিজে হাতে চাষ করেনা এমন জোতদার কুড়ি-পঁচিশ জন আছে—তাদেরও জমির পরিমাণ 30-35 বিঘের বেশী নয়। ভাগে চাষ করে অনেকে—হাল নিজেদের—ফসল আধা-আধি ভাগ হয়। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর দেড়শ' থেকে দুশো জন। আগে এদের সংখ্যা বেশী ছিল—ক্ষেতের কাজের নিরাপত্তা কম বলে এখন অনেকেই তাঁতের দিকে ঝুঁকছে। তাঁতের 'লেবার' আছে বেশ কিছু ; 'মহাজন' কেউ এখানে নেই—তারা শান্তিপুর শহরে থাকে। 'জন'-এর মজুরী ছ'টাকার সামান্য এদিক-ওদিক। খাস জমি প্রায় নেই এখানে। সবই ব্যক্তিগত জমি। বাস্তু ছাড়া সব জমিতেই চাষ হয়। প্রায় হাজার একর (3 হাজার বিঘে) হবে।

ফসল বলতে ধান আর পাট—প্রায় সমপরিমাণ জমি অধিকার করে। আখ হয় 500 বিঘের মতন জমিতে। ধান প্রধানত আউশ, গঙ্গার রিভার পাম্প-এর সুবিধাভোগী জমিগুলোতে বোরো (2-3 শ' বিঘে)। আউশের ফলন বিঘে প্রতি 4/6 মণ, পাটেরও তাই। বোরো—বিঘে প্রতি মণ কুড়ি হয়। রবিশস্য হিসেবে রয়েছে মুসুরি, ছোলা, মটর আর সামান্য গম—"এটা সেচ পেলে ভাল হত"।

জলের কথায় এসে পড়লাম। চাষের জল বলতে বৃষ্টির জল—বাদলার দিনে জমিতে আর খানা ডোবায় যা জমে। খানা ডোবাও বিশেষ নেই এখানে। জমি সরাসরি যেটুকু জল পায় তাই ভরসা। এমনিতে এসব নাবাল জমি—একটু বর্ষা হলেই ডুবে যায়। সাধারণত জোর বৃষ্টিই হয় এদিকে। জল ধরে রাখার যেমন কোনো ব্যবস্থা নেই তেমনি জল বার করারও কোনো বন্দোবস্ত নেই। বেশী বৃষ্টি হলে আর নদীতে জল বাড়লেই বিপদ—যেমন হয়েছিল আটাত্তরে। সমস্ত চরে তখন এক বুক জল—সবাইকে 'ডাঙায়' চলে যেতে হয়েছিল। জল নেবে যাওয়ার পরে জমিতে পলি পড়ে কি কিছু উন্নতি হয়েছিল ? "সে তো পলির বন্যা নয়। ধিকি ধিকি গঙ্গার জল বাড়েনি, স্রোতে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে—ও বালির বন্যা। জমি আরও অজন্মা হয়ে গেছে।"

মা গঙ্গার দয়ায় খাবার জলের কোনো সমস্যা নেই চরে। কিন্তু চাষের জন্য তাকে কাজে লাগানো হয়েছে সামান্যই। দুটো রিভার পাম্প আছে রামনগর পাড়ার ওদিকে। শ' খানেক বিঘের বেশী জল দেওয়া যায় না। আর ক্যানেল ট্যানেল কিচ্ছু না। সরকারী লোনে কিছু ইলেকট্রিক শ্যালো বসেছিল, গোটা চারেকের মোটর চুরি হয়ে গেছে—গোটা দশেক বোধহয় আছে এখন সবমিলিয়ে, কিন্তু

"ও কারেন্ট না থাকলে চলবে কিসে"? ডিজেল শ্যালো আছে খান দশেক, তবে "যা তেলের দাম, মেসিন খুললেই তো…"।

তাহলে সম্বল শুধু আকাশের জল—আর তা যদি বেগড়বাই করে তো বেগতিক—যেমন এবছর হয়েছে। "খরা—হয় কোনো কোনো বছর একটু আধটু, তবে এবছরের মত আর দেখা যায়নি।" চৈত্র থেকেই কার্যত খরা চলছে। বৈশাখে একটা বৃষ্টি পেয়ে ফসল বোনা হয়েছিল (ছিটিয়ে বোনা হয় এখানে)। তারপর আবার একটানা খরায় সব আউশ ধান নষ্ট হল। পাট—অল্পস্বল্প পেয়েছিল কেউ কেউ। বোরোটা হলে তবু অনেকে বাঁচতো, কিন্তু সব জায়গায় সরকারী সাকুলার এসেছে এবার বোরো চাষ বন্ধ রাখতে হবে। তার বদলে গম লাগাতে বলা হয়েছে। সরকারী যুক্তি—গম চাষে জল কম লাগে। "ঠিকই—কিন্তু গম বোনার সময় ছিল কার্ত্তিক-অঘ্রাণ—এখন সময় কেটে যাবার পর বলে আর কি হবে?" বললেন অভিজ্ঞ চাষীরা। এবার বোরো চাষ না হলে কোনো চাষই হবে না—সামান্য কিছু আখ কেবল হতে পারে। যেখানে ধান হয়নি সেরকম অনেক জমিতে ছোলা-মুসুরী-মটর লাগানো হয়েছিল—তারও খুব একটা ফলনের আশা দেখা যাচ্ছে না।

ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। চালের কেজি চার টাকা পঁচিশ, আটা দু'টাকা আশি। কিনে খাওয়ার সামর্থ দরিদ্র কৃষকদের নেই। বন্ধক দেওয়ার মত জিনিষপত্র যাদের যেটুকু ছিল সব দেওয়া হয়ে গেছে। তার থেকে বেশী হয়েছে বিক্রি—ঘটি-বাটি, সাইকেল, ছাগল, চৌকি—যে যা পেরেছে। "সামনে যা আসছে তাতে না খেয়ে মরতে হবে।"

মহাজনী কারবার এ সময়ে নতুন করে ফুলে ফেঁপে উঠছে। মহাজন এ অঞ্চলে আগে ছিল বেশ কিছু। "সেবার এম.-এল-এর সময় ব্যবসা গোটাতে হয়েছে।" তাদের চাঁই ছিল পাঁচু ভকত—কোটি টাকার মালিক। ধার দেওয়ার সময় চুক্তি করতো ওর কাছে পাট 30 টাকা করে বিক্রি করতে হবে। সত্তরের আন্দোলনের সময় সে নিহত হয়। তারপর যে জনা বারো-তেরো পরম্পরাগত মহাজন টিঁকে ছিল, তারা ভয়ে ভয়ে থাকতো! এবার আবার তারা একটু জোর পেয়েছে মনে হচ্ছে। ছোটো খাটো কিছু ব্যবসাদারও সুদের কারবারে নেমে পড়েছে। সুদের হার 25% মত। তবে সাধারণত ধারশোধ দেওয়ার রীতি টাকায় নয়, ফসলে।

আর বাড়ছে জুয়া। সাট্টা ঢুকেছে আগেই, নতুন একটা খেলা এসেছে, নাম 'কুপন খেলা'। খরার সময় জোর চলছে এসব—অভাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। প্রকাশ্যভাবে খেলা চলে—মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায়—বাজারের মধ্যে। গরীবের ছেলেরা দু'চার পয়সার লোভে যাচ্ছে—অনেকেই সর্বস্বান্ত হচ্ছে। হতাশায় উন্মাদ হয়ে যুবকের রেলে গলা দিয়ে আত্মহত্যা, বউকে বার করে দেওয়া—এসব ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম—মাস্তানরা জুয়ার আড্ডা থেকে তোলা তোলে—বখরা নিয়ে লড়াই বাধে—"এমন দিন যায় না যেদিন খুন হয় না"। নিয়মিত পুলিশ আসে। "দান থেকে রোজ কুড়ি টাকা করে নিয়ে যায়। অনেক সময় আবার ওই কুড়ি টাকার থেকেই পাঁচ টাকা দান ধরে পনেরো টাকা নিয়ে চলে যায়।"

এখানে শিক্ষার অবস্থা কেমন? এবিষয়ে কথা হচ্ছিল চরের একমাত্র উচ্চশিক্ষিতা ও চাকুরীজীবি মহিলা রেবা মাহাতোর সঙ্গে। এখানে চারটে প্রাইমারী স্কুল আছে, জুনিয়ার হাই দুটো। বড়দের মধ্যে স্কুলে পড়া লোক খুবই কম। গোটা শান্তিপুর শহরে এবার 182 জন মাধ্যমিক দিয়েছে—চরে তিনজন কি পাঁচজন। বাচ্চাদের মধ্যে পাঁচ শতাংশও বোধ হয় স্কুলে যায় না—ইদানিং টিফিনের লোভে কিছু…। তবে খরার সময় আবার গোবর টোবর কুড়িয়ে পরিবারের জন্য যাহোক কিছু উপার্জন করাটাই বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে।

রেবা বি. এ. পাশ করে বি. এড. পড়ছেন, শক্তিপুর জুনিয়র হাইস্কুলে (গঙ্গার ওপারে হুগলীতে) পড়াতে যান। বি. এড. পড়েন কালনা কলেজে। তাঁর চোখে পড়েছে গঙ্গার এপারে আর ওপারে সেচ ব্যবস্থার কত তফাৎ—ওপাশে রিভার পাম্প ও পাইপ দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় জল দেওয়া হয়। তার ফলে ওদিকে ধানের ফলন বেশী, উপরন্তু বোরো হয়। এদিকে সেসব সুবিধে নেই।

খরার ফলে এদিকে রোগ টোগ বেড়েছে নাকি? "অপুষ্টি ছাড়া নতুন করে কিছু দেখা দেয়নি।"

এবার রিলিফের কথা। রিলিফ বলতে ফিশারীস কো-অপারেটিভের খাদে মাটি কাটার কাজ—মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে। 40—42 জন লোক রোজ কাজ করছে সাত আট দিন ধরে, মজুরী ছ'টাকা। "একাজ আর কদিন চলবে?" খাদে গিয়ে দেখলাম শুধু কৃষকেরা নয়, মৎসজীবীরাও রিলিফের কাজ করছেন। মৎসজীবীদের খরায় কিরকম ক্ষতি হয়েছে? কালীপদ হালদার নামে একজন কাজ করতে করতে বললেন—"যা ক্ষতি হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা হলাম প্রকৃত মল্ল-ক্ষত্রিয়। আমাদের বংশে কেউ কোনোদিন মাছ ধরা ছেড়ে মাটি কাটার কাজ করেনি। অথচ এখন তাই করতে হচ্ছে। মাছ ধরবো কোথায়? সব খাদ শুকনো।" একটু থেমে বললেন, "তবে মৎসজীবীদের যা ক্ষতি করবার আপনাদের ফরাক্কাই আগে করে দিয়ে গেছে। ফরাক্কা হবার আগে গঙ্গার ওদিকে ঢোঁড়ালে থেকে এদিকে কালনার ঘাট পর্যন্ত দোরোখা স্রোত বইতো মেন ক্যানেল দিয়ে, ভাঁটার সময় জল ধরা পড়তো খাদে। তার বদলে এখন শুধু জোর একমুখী স্রোত. তাতে মাছ উঠতে চায় না।"

আর কোনো রিলিফ নেই, কোনো সার্ভেও হয়নি। খরার মার থেকে কি তাহলে কোনো রেহাই নেই? "কেন থাকবে না, সরকার ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু করতে পারে। এক্ষুনি চাষীদের খয়রাতি সাহায্য দরকার। তারপর সেচের ব্যবস্থা। চরের মাঝ বরাবর গঙ্গার থেকে ক্যানেল করা যেতে পারে। শহরের ময়লা জল এখান দিয়ে পাইপ বসিয়ে গঙ্গায় বার করবার জোগাড়যন্ত্র চলছে. আর চরের চাষ বাঁচাতে এইটুকু করা যাবে না? রিভার পাম্পের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। রামনগর চরে আর একটা রিভার পাম্প

স্যাংশন হয়ে আছে—দুবছর ধরে বসছে না। এছাড়া আরো স্যালোর দাবীও রয়েছে। জল ধরে রাখা—জল বার করা—দুটোরই সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।"

এসব কথা বললেন চরের চাষীরা। কিন্তু সরকার এই ব্যবস্থাগুলো নেবে কিনা তাঁরা জানেন না। দাবীগুলো সরকারকে জানানো হয়েছে কি? "সবাই মিলে তো সেরকম কিছু করা হয়নি। যদি পার্টি-বিশেষ কেউ জানিয়ে থাকে। সাধারণ পাবলিকের মধ্যে আর জানাবে কে?" কোন কোন পার্টি আছে এখানে? "পার্টি বলতে তো এক সি. পি. এম.—তাদেরই তো সরকার। তাছাড়া কিছু এম-এল. আছে, সামান্য কিছু আর. সি. পি. আই, আর সামান্য কংগ্রেস।" এরা কেউ এখনো পর্যন্ত কিছু করেছে বলে সাধারণ মা জানেন না। তবে তাঁরা একটা জিনিস জানেন যে, চাপ না দিলে কি হয় না। "প্রথম রিভার পাম্প কি আর এমনি এমনি বসেছিল? 67তে বয়রায় ধরমবীর এসেছিলেন, তার গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ জানানো হয়। তার পরেই না……। তখন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কানাই পাল—সে সময় ঠাকুরপন্থী আর, সি, পি. আই করতেন, পরে কমিউনিস্ট লীগে যোগ দেন। তিনি তো মারা গেছেন। তারপরে আর কিছু হয়নি।"

কদমপুর--একটি গ্রামের জল সমস্যা

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার মৌজা কদমপুর। শান্তিপুর টাউন থেকে বেশ কিছুটা যেতে হয়। ফুলিয়ারই বরং কাছে। পশ্চিমপাড়া, মুসলিম পাড়া, মাঝের পাড়া আর পূর্ব পাড়া—এই নিয়ে গোটা গ্রামটা।

গ্রামে পৌছুতেই দেখা হল পঞ্চায়েত সদস্য দুলাল বিশ্বাসের সঙ্গে। চার পাঁচজন গ্রামবাসী তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের প্রশ্ন—সরকার বা পঞ্চায়েত থেকে কি কাজের ব্যবস্থা করা হবে?

"হ্যাঁ, হবে। রাস্তা বানাবার পরিকল্পনা হয়েছে। তেঘড়ির ওরা এখান দিয়ে একটা রাস্তা চায়।" "তাতে কজনের কাজ হবে?"…

ওদের সঙ্গে কথা বলে গ্রামের জমির স্বত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত বহু তথ্য পাওয়া গেল।

কদমপুরের চাষের জমি মোটামুটি চারশ একর। মোট জনসংখ্যা 500 বা তার সামান্য বেশী। কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সংখ্যা দু'শ। প্রত্যেক শরিককে স্বতন্ত্র পরিবার হিসেবে ধরলে 150 পরিবার। এর মধ্যে কেবল নিজের জমির উপর নির্ভরশীল কুড়িটি পরিবার। গড়ে 15 বিঘে করে জমি আছে তাঁদের। সর্বাধিক জমি গৌর ভৌমিকদের—শরিক পিছু প্রায় বিশ ত্রিশ বিঘে, তাছাড়া "ওপারে কিছু জমি আছে। ওরা দু'ভাই স্কুল মাস্টারী করে।"

পঞ্চাশ ঘর মত আংশিক নিজের জমিতে চাষ করে আর কিছুটা বর্গাদারী করে কাটান। তাঁদের কারো 8—10 বিঘের বেশী জমি নেই—গড়ে আরো কম। এ ছাড়া দশ পনের ঘর পুরোই বর্গাদার। "তবে আজকাল আর কেউ জমি বর্গায় দিতে চায় না।"

সম্পূর্ণ ভূমিহীন মাত্র 10 ঘর। কিন্তু বাকি পঞ্চান্ন-ষাট ঘরও কার্যত ভূমিহীন। আট দশ কাঠা জমি থাকা আর না থাকায় বিশেষ পার্থক্য হয় না। এই 65—70 ঘর সারা বছরই ক্ষেত মজুর।

প্রায় 500 বিঘে জমির মালিকানা গ্রামের বাইরের লোকজনের হাতে। কারো দু'তিন বিঘে, কারো সাত আট বিঘে। "কেবল তুষ্ট ঘোষের কদমপুর মৌজায় 40 বিঘে জমি আছে।"

জমির মালিকানার এই চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই খরা সৃষ্ট পরিস্থিতিকে আরো সংকটময় করে তুলেছে। তবে নিজেদের জমিতে যাঁরা চাষ করেন তাঁদের পরিস্থিতিও খুব ভাল নয়।

কদমপুরে প্রধান চাষ তিনটে। আউশ, আমন আর পাট। পাট চাষ হয় তিন-চারশ' বিঘে, আউশ দুশ' বিঘের মত, আর বাকিটা আমন। বোরো চাষ বিশেষ হয় না। সব্জীর চাষ অল্প। গত কয়েক বছর ধরে 4-5 বিঘে আখের চাষ হচ্ছে।

এ গ্রামে জমি নানা রকম। 700 বিঘে মত এঁটেল মাটি। তাতে জল লাগে সবচেয়ে বেশী। এছাড়া বেলে মাটি 300 বিঘে মত। বাকিটা দোয়াঁশ। তার ফলে পাশাপাশি জমিতে দেখা যায়, কোনোটাতে ভাল ফলন হয়েছে, আর কোনোটায় বিঘেতে এক বস্তাও ধান হয় নি। জল সংকটই এর প্রধান কারণ।

এবার খরায় ক্ষতি কত হয়েছে? "তা ধরুন সত্তর ভাগ। ষাট ভাগ জলের অভাবে, আর দশ ভাগ রোগে।"

নদী খুব দূরে নয়, কিন্তু মাঝে রেল লাইন আর বড় রাস্তা। সুতরাং বৃষ্টির জল এবং ভূগর্ভস্থ জলেই চাষ করতে হয়। এবার বৃষ্টির জল কাজে লাগেনি। বরং ক্ষতি হয়েছে ভাদ্রের গোড়ায় বৃষ্টির ফলে। আগস্টের শেষ দিকে একদিন

ভাল বৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই বীজ লাগিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর আর বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ক্ষতি বেড়েছে।

একটা ডিপ টিউবওয়েল আছে—তাতে বছরে 250 বিঘে (দু'বার মিলিয়ে) জল পায়। এ ছাড়া 17টা শ্যালো টিউবওয়েল আছে। অধিকাংশই 40 ফুট+12 ফুট ফিল্টার। দু'তিনটে 60 ফুট+12 ফুট ফিল্টার। এক একটা শ্যালো ঠিক সময় মত জল দিতে পারলে বছরে (15+15) 30 বিঘেকে জল দেয়। সুতরাং টিউবওয়েলের জলে মোট 750—760 বিঘের মত চাষ করা যায়।

কিন্তু আসলে ততটা জল দেয় না। বিদ্যুৎ সংকট চাষের সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে। "হয়ত একদিন সকালে ছ'টা থেকে আটটা চলল। আবার একটা-দেড়টার পর এল।" তাতে কোনো লাভ হয় না। একই জমিতে বারবার জল দিতে হয়। ডিপ টিউবওয়েলেরও একই অবস্থা। "কোনোকোনো সময়ে টানা দুদিন কারেন্ট নেই, এমনও হয়েছে"। "একদিন একরাত্রি চালিয়েও দশ কাঠা জমিতে জল দেওয়া যায় নি।"

এ সবের ফলে জল নিয়ে গণ্ডগোল বেঁধেই থাকে।

এর সঙ্গে আছে জল চুরি আর জল বিক্রী। জল চুরি হয় নানা ভাবে। অন্যের সেচের সময়ে আল কেটে জল চুরি, যৌথভাবে কেনা শ্যালোর একজন মালিককে দু'পাঁচ টাকা দিয়ে অন্য মালিককে ঠকিয়ে জল নেওয়া, এসব হয়। দ্বিতীয় কাজটি অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই হয়, সরকারের কাছ থেকে 5-7 বিঘে চাষের নাম করে লোন নিয়ে শ্যালো কিনে অন্য চাষীদের 8-10 বিঘের মত জল বিক্রী করে।

জল সংকট কাটানোর জন্য দু'রকম দাবী করা হয়েছে। 1967 থেকে বিভিন্ন সময়ে দাবী করা হয়েছে চুর্ণি নদী থেকে ক্যানাল খননের। আর বর্তমানে মূল দাবী নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। সরকার ডিজেল শ্যালো দিচ্ছে। কিন্তু তাতে ঘণ্টায় খরচ 4·50 টাকা। বৈদ্যুতিক শ্যালোতে খরচ ঘণ্টায় 2.50 টাকা। ফলে ডিজেল শ্যালো নিতে কেউ প্রস্তুত নয়।

সাধারণ বছরে গড় উৎপাদন হয়ঃ পাট—বিঘে প্রতি 6 মণ, বোরো 10—12 মণ। বিক্রী হয় প্রধানত মহাজন মারফৎ। সাধারণভাবে উৎপন্ন ফসলের সিকি ভাগ হয় বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত। চাষের আগে কর্জ করতেই হয়, ফলে সেটা মহাজনের হাতে চলে যায়। তারা বস্তা পিছু বাজার দরের চেয়ে পাঁচ টাকা মত কম দাম ধরে—ওটাই সুদ। এ বছর তো অবস্থা আরো খারাপ। কৃষি ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কাছেও অনেকে দেনায় বাঁধা। 4 বিঘে জমির মালিক নবীরতরে মোট দেনা প্রায় আড়াই হাজার টাকা।

খরাত্রাণে কিছু হয় নি? হয়েছে অল্প কিছু। ফুড ফর ওয়ার্কে দিত দৈনিক 6 টাকা, NREP-তে 4 টাকা এবং এক কেজি চাল। সাধারণত ক্ষেত মজুররা পায় 6—7 টাকা। রোয়া আর নিড়ানোর সময়ে 8 টাকা পর্যন্ত ওঠে। এ বছর সব কাজই কম। ত্রাণে জনের কাজ হয়েছে 6 টাকা রোজ ধরে 2700 টাকার—অর্থাৎ 450টি শ্রম দিবস। সবটাই হয়েছে 12 নভেম্বর থেকে 22 নভেম্বরের মধ্যে। সব মিলিয়ে ক্ষেত মজুররা গড়ে কাজ পেয়েছে 200 দিন। অন্যান্য বছর পায় 250—275 দিন। বাকি সময়টা চালায় বনের আলু, শাক-সব্জী তুলে। বর্ষা না হওয়ায় তো সে সমস্তও কম পাওয়া গেছে। তার উপর জিনিস পত্রের দাম ক্রমেই বাড়ছে।

প্রশ্ন করলাম, মিনিকিট দেওয়া হয়েছে? হয়েছে—গম সাত প্যাকেট, সরষে আট প্যাকেট, মসুর এক প্যাকেট, ছোলা দু প্যাকেট,। সরষের গাছ হয়েছে, ফল হয় নি। গমের বীজ খারাপ—এক বিঘের গম 10 কাঠাতেও বেরোয় নি। ছোলার গাছ বেরোয় নি। মসুর হয়েছে।

চাষ ছাড়া এ গ্রামের লোকেদের কাজ কি কি আছে? বিশেষ নেই। গত 4—5 বছরে কুড়ি পঁচিশ জন চাষ ছেড়ে তাঁতের কাজ ধরেছে। তাঁতে আয় মাসে 200 থেকে 250 টাকা।

এছাড়া দু'জন স্নাতক, তাদের অন্য কাজ আছে। 10—11 জন (4 জন মেয়ে সহ) মাধ্যমিক পাশ, অষ্টম শ্রেণী অবধি শিক্ষা বারোজনের, আর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে জন পঞ্চাশের (বর্তমানে যারা হাই স্কুলে পড়ছে তারা সহ)।

খরা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠনদের বক্তব্য কি? জানা গেল, বড় দলগুলির সমর্থকদের মধ্যে ছোটোখাটো সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘটেছে। এখন আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। "মন্ত্রী তো ইলেকশনের পর এমুখো হয় নি। হঠাৎ ঐদিন এল।" গণফ্রন্ট এ গ্রামে না হলেও, কাছেই সক্রিয়। কমিউনিস্ট লীগও কিছুটা কাজ করছে।

SPACE DONATED BY :

A. Mukherjee & Co. (P) Ltd.

PUBLISHERS

2, Bankim Chatterjee St. Calcutta-73

Phone No. : 34-1606 ; 34-1499

খরা বিষয়ে আলোচনা

কৌশিক ব্যানার্জী

গত 22 নভেম্বর ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা হলে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার উদ্যোগে খরা বিষয়ে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কয়েকটি জেলায় খরার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেন সাংবাদিক নীলাঞ্জন দত্ত ও অসীম চট্টোপাধ্যায়। অসীম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানাতেই কংসাবতী প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলটি প্রকল্পের জল থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এটা এক সামাজিক অন্যায়।

ঝাড়গ্রামের 'পুণশ্চ' সংস্থার প্রতিনিধি মৃণালকান্তি দেববর্মণ এই বিষয় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গ সেচ-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার চন্দন রায় যিনি কংসাবতী প্রকল্পের সঙ্গে প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন, বলেন—যে সমস্ত জমিতে অন্যান্য শস্য চাষ হতো, প্রকল্পের জল পাওয়ার পর সেই শস্যের পরিবর্তে যেখানে ধানের চাষ শুরু হলো। ফলে এই বর্ধিত স্থায়ী জলের চাহিদা পরবর্তীকালে জলের স্থায়ী অনটনের সৃষ্টি করলো। তিনি আঞ্চলিক জল ও মাটির পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্য-পরিকল্পনা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ যথেষ্ট, প্রয়োজন হলো উপযুক্ত জল-পরিকল্পনার।

ভূ-বিজ্ঞানী সুরজিত গুহ তাঁর বক্তব্যে ভূ-গর্ভস্থ জলের সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে কুয়ো বা ইঁদারার মাধ্যমে স্বল্প খরচে স্থায়ী ও কার্যকরীভাবে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তিনি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখান যে অনেক ক্ষেত্রেই সামগ্রিক বিচারে গভীর নলকূপের চেয়ে কূয়ো অনেক বেশী লাভজনক। কূয়োর মাধ্যমে সেচের প্রতি প্রযুক্তিবিদ্‌দের স্বভাবসিদ্ধ অনাগ্রহের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক মণি মজুমদার বলেন যে পরিকল্পনা ভ্রান্ত নয়, তার পিছনের দৃষ্টিভঙ্গীই এর জন্য দায়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই অগণিত বঞ্চিত মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে মুষ্টিমেয়র স্বার্থ পুষ্ট হচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ডিসেম্বরের 7 ও 17 তারিখে বিজ্ঞান কলেজের (রাজাবাজার) অ্যাপ্লায়েড্ ফিজিক্স বিভাগে দুটি সান্ধ্য আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয়। এখানে খরা নিয়ে প্রাথমিক স্তরে সমীক্ষা চালানোর জন্য কয়েকটি কর্মীদল তৈরী করা হয়। কি ধরণের সমীক্ষা চালানো হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সমীক্ষার জন্য বাঁকুড়া ও শান্তিপুরের দুটি অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়।

॥ পত্রিকার গ্রাহকদের প্রতি ॥

কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগ থেকে পত্রিকার পোষ্টাল রেজিষ্ট্রেশনের সুবিধা তুলে নেওয়ায় পুরো ডাক খরচ দিয়ে আপনাদের কাছে পত্রিকা পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু বাড়তি এই আর্থিক দায় বহন করার মত ক্ষমতা এই মুহূর্তে নেই পত্রিকার। —নিরুপায় হয়েই চাইছি ডাক খরচের জন্য বাড়তি এই দু'টাকা আপনাদের কাছ থেকে। যারা নতুন গ্রাহক হবেন তারা ডাকযোগে পত্রিকা পেতে হলে পাঁচ টাকার পরিবর্তে সাত টাকা পাঠান। আর যারা পুরোন গ্রাহক তাদের কাছে নিবেদন পাঁচটি সংখ্যা পত্রিকা আপনারা পাবেন। তার পর গ্রাহকপদ নবীকরণের অনুরোধ করব।

With best compliments of :

Associated Transport Organisation

Fleet Owners & Transport Contractor

60/C, Colootola Street,

Calcutta-700 073

Phone : 34-0062/34-9692/32-2209 Gram : MARKABLE

With best compliments of :

Sandeep Enterprises

Engineers & Contractors

23A, Netaji Subhas Road,

2nd Floor, Room No. 8

Calcutta-700 001

জলাভাব ও মানবদেহ

পীযুষকান্তি সরকার

দীর্ঘদিন ধরে জল না খেলে

মানুষকে দিনের পর দিন জল না খেতে দিয়ে পরীক্ষা করার কথা জানা যায় নি। মাঝে মধ্যে জাহাজ ডুবীর পর বা মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে খুঁজে পাওয়া কিছু লোকের, যারা অনেকদিন ধরে জল না খেয়ে কাটিয়েছে, তাদের পরীক্ষা করে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে সেই সব রোগীর থেকে, নানা কারণে যাদের জল খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বা স্পৃহা চলে গেছে।

অনেকদিন ধরে জল না খেলে আমাদের শরীরে যে সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে সেটা শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলনায় দেরীতে দেখা দেবে। বৃদ্ধ, নারী, শিশু বা মেদবহুল লোকদের শরীরে তুলনামূলক ভাবে সঞ্চিত জলের পরিমাণ কম থাকায় লক্ষণগুলো তাড়াতাড়ি দেখা দেবে।

আমাদের শরীরের ওজনের শতকরা 50—60 ভাগ জল (পুরুষ—60%, স্ত্রী—50%)। শরীরে সঞ্চিত এই জল মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত যেমন কোষের ভেতরের (অন্তর্কোষীয়) কোষের বাইরের (আন্তর্কোষীয়) যেমন রক্ত রস, কোষ সন্নিহিত জল ইত্যাদি)।

প্রতিদিন আমাদের শরীর থেকে আড়াই থেকে তিনলিটার জল বেরিয়ে যায় (প্রস্রাব দেড়লিটার, শ্বাস কার্য্যের ফলে ও ঘামের মাধ্যমে (Insensible perspiration) ও মলে বাকী অংশ)। এই ঘাটতি পূরণ হয় জল যাওয়ার দ্বারা (প্রায় দেড়-দুই লিটার), এবং খাদ্য সঞ্চিত জল ও খাদ্য পরিপাকের সময় উৎপন্ন জলের (প্রায় এক লিটার) দ্বারা। জল না খেলে এই ঘাটতি পূরণ হবে না। আমাদের শরীরে জলের ঋণাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হবে, যতদিন যাবে ঋণ তত বাড়বে। আমাদের শরীর থেকে যে জল বেরিয়ে যায় তাতে বিভিন্ন প্রকার লবণ ও কঠিন পদার্থ যেমন ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি। (শরীরের পরিপাক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জল না খেলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার জন্য বহুলাংশে দায়ী হল এই সব কঠিন পদার্থ।

স্বাভাবিক অবস্থায় কোষের অভ্যন্তরের এবং বাইরের অভিস্রবণজনিত চাপ সমান থাকে। জল না খেলে কোষের বাইরের যে জল আছে (যেমন রক্ত, আন্তর্কোষীয় জল. ইত্যাদি) তবে অভিস্রবণজনিত চাপ বেড়ে যায়। তখন অভিস্রবণের নিয়মানুযায়ী অন্তর্কোষীয় জল বাইরে বেরিয়ে এসে আন্তর্কোষীয় জলের অভিস্রবণজনিত চাপকে কমাতে চেষ্টা করে। এর ফলে শরীরের কোষগুলির আয়তনের সংকোচন হয়। কোষের আয়তন কমে গেলে পিটুইটারী গ্রন্থি (পিছনের খণ্ড) থেকে এ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন রক্তে নির্গত হয়। এই হরমোন বৃক্কে প্রস্রাব তৈরীর সময় অধিক পরিমাণে জল শরীরে শুষে নিয়ে প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ জল না খেলে রক্তের ঘণত্ব বেড়ে যায়, অন্তর্কোষীয় পটাশিয়াম রক্তে চলে আসে। প্রথম কারণ পরোক্ষভাবে বৃক্ক থেকে রেনিন নির্গমণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যার ফলে শরীরে অ্যানজিওটেনসিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। অ্যানজিওটেনসিন ও রক্তের বর্দ্ধিত পরিমাণের পটাশিয়াম উভয়ই অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে বহুল পরিমাণে মিনারেলো কর্টিকয়েড (অ্যালডোস্টেরোন) নির্গমণে সাহায্য করে। অ্যানজিওটেনসিন নিজে বৃক্কের রক্ত চলাচল কমিয়ে দেয়। এর ফলে এবং অধিক মিনারেলো কর্টিকয়েডের দরুণ প্রস্রাবের পরিমাণ খুবই কমে যায়। প্রস্রাব কমে যাওয়ার দরুণ শরীরের বিভিন্ন দূষিত পদার্থের (কঠিন ; পূর্বে বর্ণিত) শরীর থেকে বের হতে না পেরে ক্রমাগত জমতে থাকে। এর ফলে রক্তের ও অন্তর্কোষীয় জলের অভিস্রবণজনিত চাপ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে—তৈরী হয় একটি দুষ্ট চক্র। দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বের হতে না পেরে একের পর এক লক্ষণ প্রকাশ করতে থাকে।

কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে জল খাচ্ছে না কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে শরীর থেকে যে জল বেরোবার কথা (অর্থাৎ প্রস্রাব, ঘাম ও নিশ্বাসের সাথে) সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে—ফলে শরীরে জলের পরিমাণ কমতে থাকছে (লোকসান)। এইভাবে কমতে কমতে যখন লোকসানের পরিমাণ শরীরের ওজনের শতকরা ২ ভাগে পৌছাবে তখন থেকেই লক্ষণগুলো শুরু—

প্রথম লক্ষণ হল পিপাসা। মুখের লালা বের হওয়া কমে যাবে যার জন্য, জিভ শুকিয়ে যাবে, কঠিন খাদ্যদ্রব্য গিলতে অসুবিধা হবে, গলার স্বর পাল্টে যেতে পারে। কথা বলতে কষ্ট হবে।

লোকটি দুর্বল বোধ করবে, দেহের তাপ বাড়তে থাকবে, 105° বা তারও বেশী হতে পারে।

ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, চামড়া শুকনো মনে হবে। কিন্তু চামড়ার স্থিতি-স্থাপকতা শরীর থেকে লবণ বেরিয়ে গেলে যেমন কমে যায়, এক্ষেত্রে সেটা পাওয়া যাবে না।

হৃদযন্ত্রের গতি দ্রুত হলেও রক্ত সঞ্চালণের বিশেষ তারতম্য হয় না।

মাংশপেশীর দুর্বলতা দেখা দেয়। পেশী শক্ত হয়ে যায়, মৃদু কম্পণ পরে তড়কা দেখা দিতে পারে।

প্রস্রাবের পরিমাণ অনেক কমে গেলেও সাধারণত প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে

জলাভাব ও মানবদেহ

পীযুষকান্তি সরকার

দীর্ঘদিন ধরে জল না খেলে

মানুষকে দিনের পর দিন জল না খেতে দিয়ে পরীক্ষা করার কথা জানা যায় নি। মাঝে মধ্যে জাহাজ ডুবীর পর বা মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে খুঁজে পাওয়া কিছু লোকের, যারা অনেকদিন ধরে জল না খেয়ে কাটিয়েছে, তাদের পরীক্ষা করে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে সেই সব রোগীর থেকে, নানা কারণে যাদের জল খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বা স্পৃহা চলে গেছে।

অনেকদিন ধরে জল না খেলে আমাদের শরীরে যে সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে সেটা শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলনায় দেরীতে দেখা দেবে। বৃদ্ধ, নারী, শিশু বা মেদবহুল লোকদের শরীরে তুলনামূলক ভাবে সঞ্চিত জলের পরিমাণ কম থাকায় লক্ষণগুলো তাড়াতাড়ি দেখা দেবে।

আমাদের শরীরের ওজনের শতকরা 50—60 ভাগ জল (পুরুষ—60%, স্ত্রী—50%)। শরীরে সঞ্চিত এই জল মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত যেমন কোষের ভেতরের (অন্তর্কোষীয়) কোষের বাইরের (আন্তর্কোষীয়) যেমন রক্ত রস, কোষ সন্নিহিত জল ইত্যাদি)।

প্রতিদিন আমাদের শরীর থেকে আড়াই থেকে তিনলিটার জল বেরিয়ে যায় (প্রস্রাব দেড়লিটার, শ্বাস কার্য্যের ফলে ও ঘামের মাধ্যমে (Insensible perspiration) ও মলে বাকী অংশ)। এই ঘাটতি পূরণ হয় জল যাওয়ার দ্বারা (প্রায় দেড়-দুই লিটার), এবং খাদ্য সঞ্চিত জল ও খাদ্য পরিপাকের সময় উৎপন্ন জলের (প্রায় এক লিটার) দ্বারা। জল না খেলে এই ঘাটতি পূরণ হবে না। আমাদের শরীরে জলের ঋণাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হবে, যতদিন যাবে ঋণ তত বাড়বে। আমাদের শরীর থেকে যে জল বেরিয়ে যায় তাতে বিভিন্ন প্রকার লবণ ও কঠিন পদার্থ যেমন ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি। (শরীরের পরিপাক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জল না খেলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার জন্য বহুলাংশে দায়ী হল এই সব কঠিন পদার্থ।

স্বাভাবিক অবস্থায় কোষের অভ্যন্তরের এবং বাইরের অভিস্রবণজনিত চাপ সমান থাকে। জল না খেলে কোষের বাইরের যে জল আছে (যেমন রক্ত, আন্তর্কোষীয় জল, ইত্যাদি) তবে অভিস্রবণজনিত চাপ বেড়ে যায়। তখন অভিস্রবণের নিয়মানুযায়ী অন্তর্কোষীয় জল বাইরে বেরিয়ে এসে আন্তর্কোষীয় জলের অভিস্রবণজনিত চাপকে কমাতে চেষ্টা করে। এর ফলে শরীরের কোষগুলির আয়তনের সংকোচন হয়। কোষের আয়তন কমে গেলে পিটুইটারী গ্রন্থি (পিছনের খণ্ড) থেকে এ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন রক্তে নির্গত হয়। এই হরমোন বৃক্কে প্রস্রাব তৈরীর সময় অধিক পরিমাণে জল শরীরে শুষে নিয়ে প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ জল না খেলে রক্তের ঘণত্ব বেড়ে যায়, অন্তর্কোষীয় পটাশিয়াম রক্তে চলে আসে। প্রথম কারণ পরোক্ষভাবে বৃক্ক থেকে রেনিন নির্গমণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যার ফলে শরীরে অ্যানজিওটেনসিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। অ্যানজিওটেনসিন ও রক্তের বর্দ্ধিত পরিমাণের পটাশিয়াম উভয়ই অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে বহুল পরিমাণে মিনারেলো কর্টিকয়েড (অ্যালডোস্টেরোন) নির্গমণে সাহায্য করে। অ্যানজিওটেনসিন নিজে বৃক্কের রক্ত চলাচল কমিয়ে দেয়। এর ফলে এবং অধিক মিনারেলো কর্টিকয়েডের দরুণ প্রস্রাবের পরিমাণ খুবই কমে যায়। প্রস্রাব কমে যাওয়ার দরুণ শরীরের বিভিন্ন দূষিত পদার্থের (কঠিন ; পূর্বে বর্ণিত) শরীর থেকে বের হতে না পেরে ক্রমাগত জমতে থাকে। এর ফলে রক্তের ও অন্তর্কোষীয় জলের অভিস্রবণজনিত চাপ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে—তৈরী হয় একটি দুষ্ট চক্র। দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বের হতে না পেরে একের পর এক লক্ষণ প্রকাশ করতে থাকে।

কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে জল খাচ্ছে না কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে শরীর থেকে যে জল বেরোবার কথা (অর্থাৎ প্রস্রাব, ঘাম ও নিশ্বাসের সাথে) সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে—ফলে শরীরে জলের পরিমাণ কমতে থাকছে (লোকসান)। এইভাবে কমতে কমতে যখন লোকসানের পরিমাণ শরীরের ওজনের শতকরা ২ ভাগে পৌছাবে তখন থেকেই লক্ষণগুলো শুরু—

প্রথম লক্ষণ হল পিপাসা। মুখের লালা বের হওয়া কমে যাবে যার জন্য, জিভ শুকিয়ে যাবে, কঠিন খাদ্যদ্রব্য গিলতে অসুবিধা হবে, গলার স্বর পাল্টে যেতে পারে। কথা বলতে কষ্ট হবে।

লোকটি দুর্বল বোধ করবে, দেহের তাপ বাড়তে থাকবে, 105° বা তারও বেশী হতে পারে।

ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, চামড়া শুকনো মনে হবে। কিন্তু চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা শরীর থেকে লবণ বেরিয়ে গেলে যেমন কমে যায়, এক্ষেত্রে সেটা পাওয়া যাবে না।

হৃদযন্ত্রের গতি দ্রুত হলেও রক্ত সঞ্চালণের বিশেষ তারতম্য হয় না।

মাংশপেশীর দুর্বলতা দেখা দেয়। পেশী শক্ত হয়ে যায়, মৃদু কম্পণ পরে তড়কা দেখা দিতে পারে।

প্রস্রাবের পরিমাণ অনেক কমে গেলেও সাধারণত প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে

যায় না।

জল লোকসানের পরিমাণ শরীরের ওজনের শতকরা 15—25 ভাগ হলে পরে লোকটি শ্বাস কার্য্য বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

জল না খাওয়ার সাথে যদি কোন লোক অনশণ করে বা আধপেটা খেয়ে থাকে তবে ওপরের লক্ষণগুলোর প্রকাশ কম হবে। জাহাজডুবীর পর লোক সমুদ্রে ভাসতে থেকে যদি সমুদ্রের জল খেয়ে ফেলে তবে লবাক্ত জলের জন্য রক্তের ঘণত্ব বেড়ে গিয়ে লক্ষণগুলো প্রকাশকে তরান্বিত করবে।

জল কম খেলে

স্বাভাবিক অবস্থায় দৈনিক কমবেশী 2½ থেকে 3 লিটার জল আমাদের লোকসান হয় অর্থাৎ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। পর্য্যাপ্ত খাবার খেলে তার থেকে প্রায় 1 লিটার জল পাওয়া যায়। বাকী 1½ থেকে 2 লিটার জল দৈনিক আমাদের প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে জ্বর হলে প্রয়োজন আরো বেশী কারণ এখন অত্যধিক ঘাম বা দ্রুত শ্বাস কার্য্যের দরুণ বেশী জল লোকসান হয়।

স্বাভাবিক ভাবে আমাদের দৈনিক 1½ থেকে 2 লিটার জলের প্রয়োজন। জল খাওয়ার পরিমাণ এর থেকে কম হলে ওপরের লক্ষণগুলো আংশিক ভাবে দেবে। লক্ষণগুলোর গুরুত্ব কতটা জল কম খাওয়া হল তার ওপরে নির্ভর করবে। তবে আশার কথা যে না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে থাকলে কম জল খেলেও চলবে। আমিষ জাতীয় খাদ্যের তুলনায় শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশী খেলে কম জল খেলেই চলে যায়।

পানের অযোগ্য জল খেলে

দূষিত জল খেলে পেটের নানা রকম অসুখ হয় যেমন আমাশয়, রক্ত আমাশয়, পেট খারাপ, কলেরা, টাইফয়েড, কৃমি (আন্ত্রিক), ইত্যাদি।

দূষিত জল ছাড়াও দক্ষিণ বংগে বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা নলকূপের যে জল খেয়ে থাকেন সেটা দূষিত না হলেও খুবই লবণাক্ত। দীর্ঘ দিন ধরে এই লবণাক্ত জল খেলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কিনা সেটা নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই।

সবশেষে, একটা কথা বলতেই হয়—

কোন লোক যদি প্রতি দশ মিনিটে 50—200 মিঃ লিঃ জল 3—7 ঘণ্টা খেয়ে যায় তবে তার প্রস্রাবের পরিমাণ মোট জল খাওয়ার পরিমাণের থেকে বেশী হবে। তার ফলে শরীরে জলের ঋণাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে অর্থাৎ লোকসান বেশী হবে আর সেই জন্য জল না খাওয়ার মত লক্ষণগুলো প্রকাশ পাবে।

খরায় অনাহার ও মানবদেহ

সৌমেন গুহ

খরা তো শুধু জলাভাব নয়—খরা মূলত শষ্যহানি। অনিবার্যভাবে আসে অনাহার, দুর্ভিক্ষ। মানুষ যা পায় তাই খায়—বা খেতে পায় না প্রায়ই। মৃত্যু হয় অনেকের—একদিন, দশদিন বা এক মাস বা তিন মাসে হয়তো সে মৃত্যুকে দেখা যায় না। নিঃশব্দে, তিল তিল করে মৃত্যু আসে বলেই—খরা-শষ্যহানি-অনাহারের মৃত্যু নথিভূক্ত হয় না সরকারীভাবে। যা খুশী খাবেই—কেউ যখন খেতে পায় না। পরিণতিও অপুষ্টি—ঠিক কথা। কিন্তু অনাহার মানেই অ-পুষ্টি নয়—অনাহারের নিজস্ব শরীরতত্ত্ব আছে। তাকে বোঝা যায়—এমন কি স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও। চিকিৎসা বিজ্ঞানে, একটু চেষ্টা করলেই অনাহারের শরীরতত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাওয়া যাবে।

শরীর চালনার শক্তি দরকার। খাবার না খেলে—সে শক্তি শরীরের সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট আর মেদ (fat) থেকে আসে। মানুষের লিভার ও মাংসপেশীর গ্লাইকোজেন—এই কার্বোহাইড্রেট যোগান দিতে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। যদি মেদবহুল শরীর হয় (আর সেটা ভারতের নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রায় অসম্ভব), আরো কিছু শক্তির যোগান পাওয়া যায়।

মেদ, অতিরিক্ত বিপাকের (metabolism) ফলে শুরু হয় কিটোসিস্ (ketosis) প্রস্রাব পরীক্ষায় ধরা পরে অতিরিক্ত কিটোন (ketone)—আর অম্লতা (acidity) ও অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। প্রস্রাবের এই অস্বাভাবিকতাই কিটোনিউরিয়া (ketonuria)। এ ছাড়া রক্তেও কিটোন জমতে থাকে—দেখা দেয় কিটোনিমিয়া (ketonœmia)। বোঝা যায়, লিভারের গ্লাইকোজেন সঞ্চয় কমে গেছে—লিভার ঠিক কাজ করছে না।

কিটোসিস্-এর আক্রান্ত মানুষের নিঃশ্বাস ও প্রস্রাবে অ্যাসিটোনের স্পষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। সারা দিনের প্রস্রাবে স্বাভাবিক 5 থেকে 10 মিলিগ্রামের পরিবর্তে, 200 মিলিগ্রামেরও বেশী বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটারিক অ্যাসিড বেরোতে শুরু করে।

মেদ থেকে শক্তি নেওয়া শেষ হলে (মেদ না থাকলে তো কথাই নেই), মাংসপেশীর টিস্যু থেকে প্রোটিন খরচ হতে থাকে শক্তি যোগাতে। এটা

এমন কি শরীরের নাইট্রোজেন-বিহীন জ্বালানী শেষ হওয়ার আগেই শুরু হতে পারে। টিস্যু প্রোটিন ভাঙে, খরচ হয়—বিভিন্ন মাংসপেশী বিকল হতে শুরু করে (মস্তিষ্ক ছাড়া সর্বাঙ্গে)।

অনাহারের শুরুতে দেহ থেকে নাইট্রোজেন নানা ভাবে পরিত্যক্ত হয়—কিন্তু অনাহারের যত দিন বাড়ে, খুব দ্রুত বাড়তে থাকে নাইট্রোজেন বেরিয়ে যাওয়ার পরিমাণ।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজকর্ম ঠিকঠাক চালানোর জন্যে রক্তে শর্করার মাত্রা যথেষ্ট রাখতে—প্রোটিন ভেঙ্গে গ্লুকোজ যোগান দিতে থাকে কিটোসিস্ আক্রান্ত মানুষ। ঠিক এই অবস্থাটা এখন উপসর্গের দিক থেকে ডায়াবেটিস্-এর রোগীর মতে অনেকটা।

ক্রমশ নেমে আসে সংজ্ঞাহীনতা—অবশেষে মৃত্যু।

অনাহারের শুরু থেকে পরিণতি পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তকে পরীক্ষা করা যায় শরীরতত্ত্ব দিয়ে। অ-পুষ্টি না অনাহারে মৃত্যু—বিতর্কের উত্তর দেওয়া যায় বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু অনাহারে বেঁচে থাকা—জটিল শরীরতত্ত্ব। শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার থেকেও বাড়তি শ্রম করলে—কিটোসিস্ বাড়বে আরো দ্রুত। 'শ্রমের বিনিময়ে' খাদ্য নয়—আসবে বড় ক্ষতি। ক্ষতিগ্রস্ত লিভার (এমন কি হৃদযন্ত্রের পেশী) সুস্থ করতে সময় ও সাবধানতা লাগে অনেক। খরা থেকে অনাহার—অসুস্থ করে তোলে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে। একটা সময় আসে তাদের, যখন—অর্থ, শ্রম, খাদ্য দিয়ে উদ্ধার করা যায় না। সযত্ন শুশ্রূষায় সুস্থ করার দরকার সব চেয়ে আগে। খরা অনাহার, খরা দুর্ভিক্ষ—খরা অসুস্থতার মহাপ্রলয়॥

[Keys., Brozek, আরো ক'জনের লেখা The Biology of Human Starvation (Oxford. 1950) গ্রন্থটি যোগাড় করতে পারলে, অনাহারের শরীরতত্ত্বের বিষয়ে আরো জানতে পারতাম।]

খরার মুখে জলের ভাবনা

সম্পাদকমণ্ডলী

মাটি আছে মানুষ আছে—জলও আছে। একটু খাটাখটুনী করলে পেটের ভাতটা জুটবে—এই প্রত্যাশা স্বাভাবিক। কিন্তু জুটছে না। কারণ সেই খাদ্য উৎপাদনে যে জলের প্রয়োজন তার সরাবরাহ অনিয়মিত। সেটা প্রকৃতির হাতে। তার যোগান কখনও বেশী কখনও কম। —তাই বন্যা এবং খরা। সেজন্যই মানুষের এই দুর্ভোগ। এই রকমই বলা হয় আমাদের। কিন্তু যুক্তিটা সেকেলে। আজকের সংজ্ঞায়—একদিকে মানুষ দরিদ্র অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় তাই খরা আছে বন্যা হয়। এর উল্টোটা নয়। নিছক কথার মারপ্যাঁচ নয় এটা। সমাজের বহু কার্যকারণ সম্পর্কের মানুষের অগ্রগতির সাথে বদলায়। এটাও বদলে গেছে। আমরা জানিনি। বন্যা খরা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এসব জানাবার কর্তা যারা তারা এখনও পুরণো যুক্তিটাই দেন।

এখন অবস্থায় অনেকেই অসহায় বোধ করেন। অনেকে খয়রাতি তহবিলে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়ে খানিক হাল্কা হতে চান। আমরাও বিব্রত। কোনো সাহায্যে আসা যায় কিনা ভাবছি। তবে একটু অন্যভাবে। ত্রাণকার্যে সরাসরি যোগ দিয়ে নয়। ওটা আশু প্রয়োজন—সরকার করছেন। আমরা, কিছু বিজ্ঞানকর্মী ঠিক করেছি একটি কি দুটি ছোট এলাকার জলসমস্যার ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখব। আঞ্চলিকভাবে কিছু সমাধান সূত্র পাওয়া যায় কিনা ভাবব।

বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা থেকে যে দু'টি অঞ্চল বেছে নেওয়া হয়েছে নমুনা সমীক্ষার জন্য তার একটি বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর আর একটি নদীয়ার শান্তিপুরের কদমপুর ও চরজিজিরা। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র থেকে যাবেন ঝাড়গ্রামে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ক্লাব থেকে যাবেন পুরুলিয়া। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউ কেউ এইভাবে ভাবতে চাইছেন। বীরভূমের ও চুঁচুড়ার কিছু বন্ধুও উৎসাহ প্রকাশ করেছেন অনুরূপ কাজে।

সকলের কাছেই অনুরোধ—আপনারাও শুরু করুন এ ধরণের কাজ। একযোগে অনেক জায়গায় একই লক্ষ্যের একটি কাজের বিশেষ সামাজিক প্রভাব আছে। এর প্রয়োজনও আছে। মানুষের সচেতন প্রতিক্রিয়া ওপরওলাদের সামান্য হলেও নাড়া দেয়।—বিশেষজ্ঞদের ভাষায়। মানুষের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে তাদের আত্মমগ্ন অবস্থা চলেছে। —এটা ভাঙ্গা দরকার।

এবার কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রশ্ন উঠবে কি করা যায় এবং কিভাবে? বলতে কি আমরাও যে জানি তাও নয়। তবুও অনুমান ও কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি কর্মসূচী ঠিক করেছি। পুরো কাজটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন এক, প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য খরা ও জল সমস্যা বিষয় আলোচনাচক্র।

দুই, তথ্য সংগ্রহের জন্য আঞ্চলিক সমীক্ষা।

তিন, প্রচারের জন্য পোষ্টার, স্লাইড ইত্যাদি প্রদর্শনী।

চার, আঞ্চলিকভাবে সমস্যা সমাধানের কোন সুপারিশ তৈরী করতে পারলে

স্থানীয় মানুষদের মাধ্যমে তা কার্যকর করার প্রয়াস।

পাঁচ, প্রত্যেকটি পর্যায়ে তথ্য ও অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করা।

ইতিমধ্যেই কয়েকটি আলোচনাচক্রে মিলিত হয়েছি আমরা, প্রারম্ভিক কিছু অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে। তথ্য সংগ্রহের শেষে আবার আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হবে। প্রাথমিকভাবে তিনজন করে একটি সমীক্ষক দল ঠিক হয়েছে।

কি কি বিষয় সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে তার সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া যাক। আমাদের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট একটি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনে জলের চাহিদা যোগান, বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র অনুসন্ধান করা। বোঝাই যাচ্ছে বিষয়টির সাথে সামাজিক অর্থনৈতিক ভূ-প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত নানান প্রশ্ন জড়িত। অতএব স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে সমীক্ষা একটু বিস্তৃত হবে। তবে পরে তা আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হবে আশা রাখি। বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

এক। ভৌগলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে জমি, মাটি, আবহাওয়ার বিবরণ অন্তর্গত।

দুই। জনসংখ্যা। পরিবার সংখ্যা। মূল জীবিকা। অন্যান্য পেশা। কৃষি পশুপালন প্রথাগত গ্রামীন শিল্প ক্ষুদ্রশিল্প ইত্যাদি বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট লোকের সংখ্যা।

তিন। জলের উৎস। খাল, বিল, নদী পুকুর দীর্ঘ কুয়ো নলকূপ স্যালো ও ডিপ টিউবওয়েল-এর সংখ্যা, সম্ভাব্য জল বহন ক্ষমতা, ঋতুভেদে ক্ষমতার তারতম্য, বর্তমান অবস্থা, পরিচর্যার ব্যবস্থা, ব্যয় ইত্যাদি।

চার জলের ব্যবহার। পানীয় ও সেচের জলের উৎস। আহরণ পদ্ধতি।

পাঁচ। কৃষি জমির পরিমাণ, ফসলের প্রকৃতি, ফলন, জল সেচের ব্যবস্থা ও আনুসঙ্গিক চুক্তি. প্রয়োজনের পরিমাণ ঘাটতি ইত্যাদি।

ছয়। এবারের খরা পরিস্থিতির বিবরণ। ক্ষয়ক্ষতির ধরণ ও আনুমানিক পরিমাণ। খরা মোকাবিলায় স্বল্প ও দীর্ঘকালীন সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াস। রিলিফ ও কর্ম সংস্থান প্রকল্প। অন্যান্য বছরের অভিজ্ঞতা।

সাত। স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুসন্ধান। রোগ, অ-পুষ্টি, মৃত্যু— স্ত্রীলোক পুরুষ শিশু আলাদাভাবে—বিশেষভাবে শিশুদের অবস্থা।

আট। স্থানীয় মানুষ-জনদের মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ এবং সুপারিশ সংগ্রহ করা।

নয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে আনুসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ।

কাজের সুবিধার জন্য সমীক্ষক দল এই বিষয়গুলিকে প্রশ্ন আকারে সাজিয়ে নিতে পারেন। তাতে প্রশ্নগুলি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হবে।

এটি একটি পরীক্ষামূলক প্রয়াস। আমাদের ক্ষমতা সীমিত। আপনারাও ভাবুন। মতামত ও পরামর্শ দিন। তরুন ছাত্র যুবক ভাইদের অনেকেই আছেন কিছু করতে চান। এ ধরণের কাজ বোধ হয় করা যায়। স্থানীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার সাহায্যে অনুরূপ কাজের উদ্যোগ নিন। আমাদের জানান কিভাবে সহায়তা করতে পারি। মনে হয় আমরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারি। আমাদের পত্রিকা সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র

খরা এবং জলসম্পদ বিষয়ে কিছু পুস্তক, প্রবন্ধ, রিপোর্ট ইত্যাদির একটি তালিকা দেওয়া হল। তালিকাটি অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে আপনাদের জানা তথ্য-সমূহ আমাদের জানান। খরা সম্পর্কে জানতে এবং কিছু কাজ করতে আগ্রহী বন্ধুদের সহায়ক হবে এই তালিকা।

1. *Ground Water Resources of Bengal*, A. K. Roy, Chief Hydrologist, Central Water Board, Govt. of India, 1973.
2. *Proceedings of the Seminar on Drought*, Dec. 26-29, 1968, University of Agricultural Sciences, Habbal, Bangalore.
3. *India's Water Wealth*, K. L. Rao, Orient Longman, 1975.
4. *West Bengal : Drought and Water Management : A Paradox*, S. K. Guha, Frontier, Voll. 11, No. 42. June 16, 1979.
5. *Ground Water*, A. N. Sayre, Scientific American Resource Library, Earth Science series, (Off Print, Indian-Edition), Vol-1, Taraporevala P. I. Pvt. Ltd
6. *Ground Water Resources of Bengal*—A. L. Kulson. 1941.
7. *Geological Survey of India Bulletin*. No. 34. D. S. Deshmukh.
8. *Blossoms in the Dust*, Kusum Nayar, 1963.
9. *CRESSIDA Transactions* Vol. 1, No. 2, 1982
10. *Dry Farming in Mysore State*—National Council for Applied Economic Research, New Delhi, 1970.
11. *Drought Prone Areas in India*—T. Singh, PPH, New Delhi, 1978.
12. *Drought its Causes and Effects*—Ivan Ray Jannehill, The University Press, Princeton, 1947.
13. *Parched Earth : The Maharashtra Drought—1970-73* —U. Subramanian, Longman, Bombay, 1975.
14. *Note on the protection from drought of areas subject to scarcity and famine*—E. O. Mawson, Rajkot, 1901.
15. *How bureocracy mets a crisis*, Three studies—Kuldeep Mathur and others, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 1975.
16. *Drought in Maharastra : not in a hundred years*—Wolf Ladejinsky, 1973.
17. *Politics of natural disaster, the case of the Sahel drought* —M. H. Glantz, Praeger, N. Y., 1975.
18. *Development of drought-prone areas*—N. K. Jaiswal & N. V. Kolte, National Institute of Rural Development, Hyderabad, 1981.
19. *Report on Survey* conducted by the Agricultural Finance Commission on behalf of C. A. D. C. for Purulia Project, 1975.
20. **খরা অর্থনীতি ঃ** প্রদোষ নাথ, অন্য অর্থ, সংখ্যা 14-15, জানুয়ারী 1980.
21. *Famine and Drought at Palamau*—Suresh Singh.
22. *Impact of drought on rural life*—V. Barker & M. Nadkarni, Bombay, 1975.
23. *Dry Farming in India*—N. V. Kanitkar, I. C. A. R., 1960.
24. *Rainfall and Famine*, H. H. Mann, I. C. A. E., 1955.

শিশুর কল্যাণ
নারীর সম্মান
দেশের উত্থান

চারা গাছ একদিন হয়ে ওঠে উপবন
আজকের শৈশব কালকের যৌবন।
শিশুই দেশের কর্ণধার
এর কাঁধে রয়েছে ভবিষ্যতের ভার।

নতুন বিশ দফা কর্মসূচীতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য সুসংহত শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মা শুধু যে শিশুর জননী তাই নয়, তার প্রথম শিক্ষাদাত্রীও বটে। তাঁরাই দেশকে সত্যিকারের গড়ে তোলেন। নারী ও শিশুর কল্যাণের ওপরেই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি।

তাই শিশু কল্যাণ ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই কার্যসূচীকে নতুন জীবন দেওয়া হচ্ছে।

বালকের পুষ্টি আহার
যখন হয় সীমিত পরিবার।

বিস্তৃতভাবে জানতে হলে নিম্নলিখিত এই কূপন ব্যবহার করুন।

শ্রী ডি এল ঘোষাল
অ্যাসিস্টেণ্ট ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার,
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেণ্টার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা–৭০০০৭৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম.....

ঠিকানা.....

.....পিন.....

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

davp 82/418

হাওড়ায় চাষযোগ্য 93500 হেক্টর জমির মধ্যে চাষ হয়েছে আঠাত্তর হাজার হেক্টরে। খরার প্রথম দফায় ধানের ক্ষতি শতকরা সতের ভাগ পাটের ক্ষতি শতকরা বত্রিশ ভাগ, গত 1981-82-তে লক্ষ্যমাত্রা 546700 টন খাদ্যশস্যের মধ্যে উৎপন্ন হয়েছিলো 180000 টন।

নদীয়ার অ-সেচ এলাকায় পঁয়ত্রিশ হাজার একর জমির আমন চাষ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। আক্রান্ত বারো লক্ষ মানুষ।

হুগলীতে কংসাবতীর কম্যাণ্ড এলাকায় তিরিশ হার একর জমির চাষ প্রায় নষ্ট. সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে আদৌ জল দেয়নি কংসাবতী। আমন চাষ নষ্ট হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ একর জমির।

বর্ধমানে DVC-র কম্যাণ্ড এলাকার 587000 একর জমির শতকরা ষাট ভাগ জল পেয়েছে। জেলার প্রায় চার লক্ষ ক্ষেতমজুর বেকার। মোট 33-টি ব্লকের মধ্যে 10-টি ব্লকে চাষ প্রায় হয়নি। আসানসোল মহকুমার আমন চাষের জমি একশত পঁয়ষট্টি হাজার হেক্টর, চাষ হয়েছে মাত্র আটত্রিশ হাজার হেক্টরে অধিকাংশ জেলার ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। ফলে গোটা পশ্চিমবঙ্গ 1983-তে তীব্র পানীয় জল সঙ্কটের মুখোমুখী হচ্ছে।

গোটা পুরুলিয়ায় সেচ প্রায় নেই। মাত্র শতকরা চোদ্দ ভাগ জমি সেচের আওতায় তার মধ্যে শতকরা আট ভাগ জমিতে পুরনো ডোবা-পুকুরের জল থেকে সেচ হয়, তাও শুকিয়ে গেছে। মোট 41-টি রিভার লিফ্টের মধ্যে 14-টি 1982-র শুরু থেকেই অচল। বাকিগুলো তেলের অভাবে অচল। জেলায় প্রতি-বছর খাদ্যশস্য উৎপাদনে শতকরা চল্লিশ ভাগ ঘাটতি থাকে। গত 1981-তে হয়েছে শতকরা তিরিশ ভাগ কম. এবার শতকরা দশ ভাগ উৎপাদনও হবে না।

24 পরগণায় 400 নলকূপ অকেজো। সুন্দরবন অঞ্চলে ধানের চারাগাছের অভাবে পতিত হয়ে পড়ে আছে শতকরা তিরিশ ভাগ জমি। জেলার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ফসল নষ্ট।

বীরভূমে হিংলো জলপ্রকল্প বত্রিশ হাজার একর কম্যাণ্ড এলাকার মধ্যে জল দিয়েছে পনেরো হাজার একরে, তার মধ্যে বেশ খানিকটা নষ্ট হয়েছে আপার এলাকায়। ইলামবাজারে 3-টির মধ্যে 2-টি গভীর নলকূপ অকেজো।

রাজ্যে খরাক্রান্ত মানুষের সংখ্যা চার কোটি, আক্রান্ত গ্রাম পঁচিশ হাজার, শস্যের ক্ষতি নয়শত পঞ্চাশ কোটি টাকা।

নভেম্বর ঃ—সুন্দরবনে আমন নষ্ট শতকরা ষাট ভাগ, পানীয় জল প্রায় নেই।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কংসাবতী-ময়ূরাক্ষীর জল একেবারেই পাওয়া যায় নি। রাজ্যে পাটের ক্ষতি সাতান্ন কোটি টাকা, আউশ তিপান্ন কোটি তিন লক্ষ, আমন পাঁচশ কোটি, রবিশস্য তিনশত চল্লিশ কোটি টাকার।

উত্তরবঙ্গ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ী অঞ্চলে শতকরা ষাট ভাগ ধান, শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ পাট নষ্ট। ফাঁসীদেওয়া-খড়িবাড়ীতে শতকরা চল্লিশ ভাগ শস্য নষ্ট।

DVC-র Right Bank Canal দিয়ে জল ছাড়া হবে না—সরকারী ঘোষণা। বর্ধমানের কাটোয়া, মন্তেশ্বরের আটচল্লিশ হাজার একর জমি. হুগলীর আরামবাগ আবার বঞ্চিত।

হুগলীতে সত্তর ভাগ মাঠের ধান গাছ শুয়ে পড়েছে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ জমিতে ফসল বোনাই হয়নি। হাওড়া, 24 পরগণা প্রায় শ্মশান।

21 অক্টোবর থেকে DVC-র জল পুরোপুরি বন্ধ।

শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ জমিতে এবার রবিশস্যের চাষ হবে না। যেখানে চব্বিশ লক্ষ হেক্টরে রবিশস্য হতো, সেখানে এবছর চাষ হবে মাত্র 13.46 লক্ষ হেক্টর জমিতে।

বাঁকুড়ার আমন নষ্ট 75 শতাংশের বেশী। জেলার তেইশ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে খরায় আক্রান্ত সতের লক্ষ মানুষ। আউশ নষ্ট হয়েছে সত্তর শতাংশ।

পুরুলিয়ায় আমনের ক্ষতি আশি শতাংশ। জেলার আঠারো লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত তের লক্ষ।

ডিসেম্বর ঃ—মালদহে পঁচাত্তর হাজার একর পাটের জমির মধ্যে চাষ হয়েছে ছেচল্লিশ হাজার একরে। স্বাভাবিক পাট উৎপাদন এক লক্ষ ষাট হাজার টন. হয়তো হবে ছেষট্টি হাজার টন। আউশের এলাকা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একর, চাষ হয়েছে সত্তর হাজার একরে। আশঙ্কা—উৎপাদন কম হবে 19 45 হাজার টন। অঙ্কের মূল্যে ক্ষতি তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ এক হাজার টাকা। আমন শতকরা 16.4 ভাগ জমিতে রোয়াই হয়নি। সরকারী অনুমান—74.24 লক্ষ টন চাল কম উৎপাদন হবে, ক্ষতি তের কোটি ছত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা। রবিশস্যের চাষ হয় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার হেক্টরে. এ বছর পঁচাত্তর হাজার হেক্টরের বেশী হবে না। মোট পঁচাত্তর হাজার একর বোরো চাষের মধ্যে এবছর হবে পঁচিশ হাজার একরে। গভীর নলকূপ 64টি অকেজো। শ্যালো অচল 122-টি, সচল 117-টি। গুটি পোকা চাষের আট লক্ষ এক হাজার কিলোগ্রাম গুটি নষ্ট, শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ তুঁত গাছ মারা গেছে আম হবে কি না সন্দেহ।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রিন্টার্স, 8, ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলিকাতা-700010 হইতে মুদ্রিত॥